খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

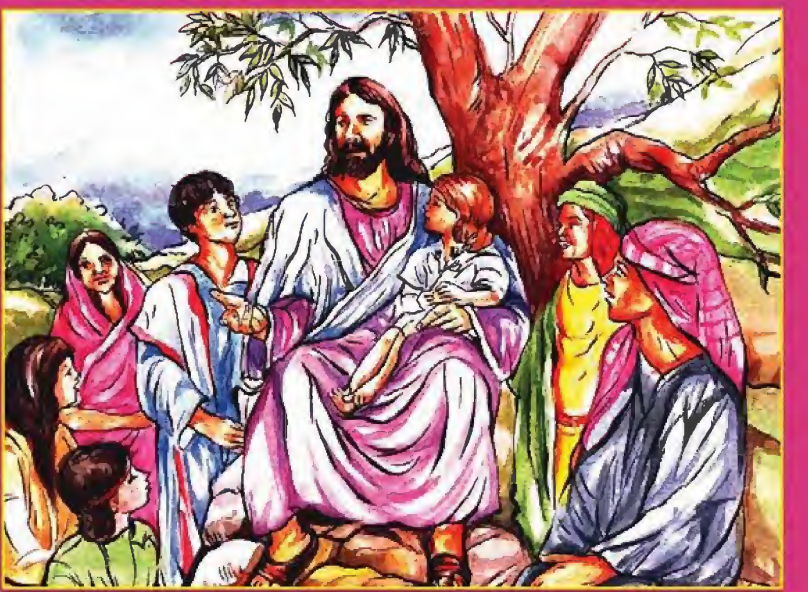

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি
সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
সিস্টার মেরী দীপ্তি , এসএমআরএ
মিসেস সিলভিয়া মজুমদার

চিত্রাঙ্কন

ডমিয়ন নিউটন পিনারু

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
ফেরিয়াল আজাদ

গ্রাফিক্স
ডমিয়ন নিউটন পিনারু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। একথা মনে রেখেই এবারের খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার দিকটি যোগ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যেন ধর্মশিক্ষা শুধু তত্ত্বগত দিকেই সীমিত না থাকে, বরং তা যেন জীবনের সার্বিক দিকগুলোকে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত এবং মনোপেশিজ দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে।

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো ও মন্দের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ও ভালোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে, অতঃপর ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণী ও প্রকৃতিকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চিনতে এবং ভালোবাসতে পারে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ ও তার উৎস	১–৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	৫–৮
তৃতীয় অধ্যায়	ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর	৯–১১
চতুর্থ অধ্যায়	শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি	১২–১৭
পঞ্চম অধ্যায়	পবিত্র বাইবেল	১৮–২১
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	২২–২৫
সপ্তম অধ্যায়	পাপ	২৬–৩০
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতার জন্ম	৩১–৩৫
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মার দান ও ফল	৩৬–৪০
দশম অধ্যায়	খ্রিষ্টমণ্ডলী	৪১–৪৪
একাদশ অধ্যায়	সাক্রামেন্ত	৪৫–৪৮
দ্বাদশ অধ্যায়	নোয়া (নোহ)	৪৯–৫২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা	৫৩–৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	মৃত্যু ও পুনরুত্থান	৫৮–৬১
পঞ্চদশ অধ্যায়	বিশ্বাসমন্ত্র	৬২–৬৫
ষোড়শ অধ্যায়	ভূমিকম্প	৬৬–৬৮
সপ্তদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ	৬৯–৭২

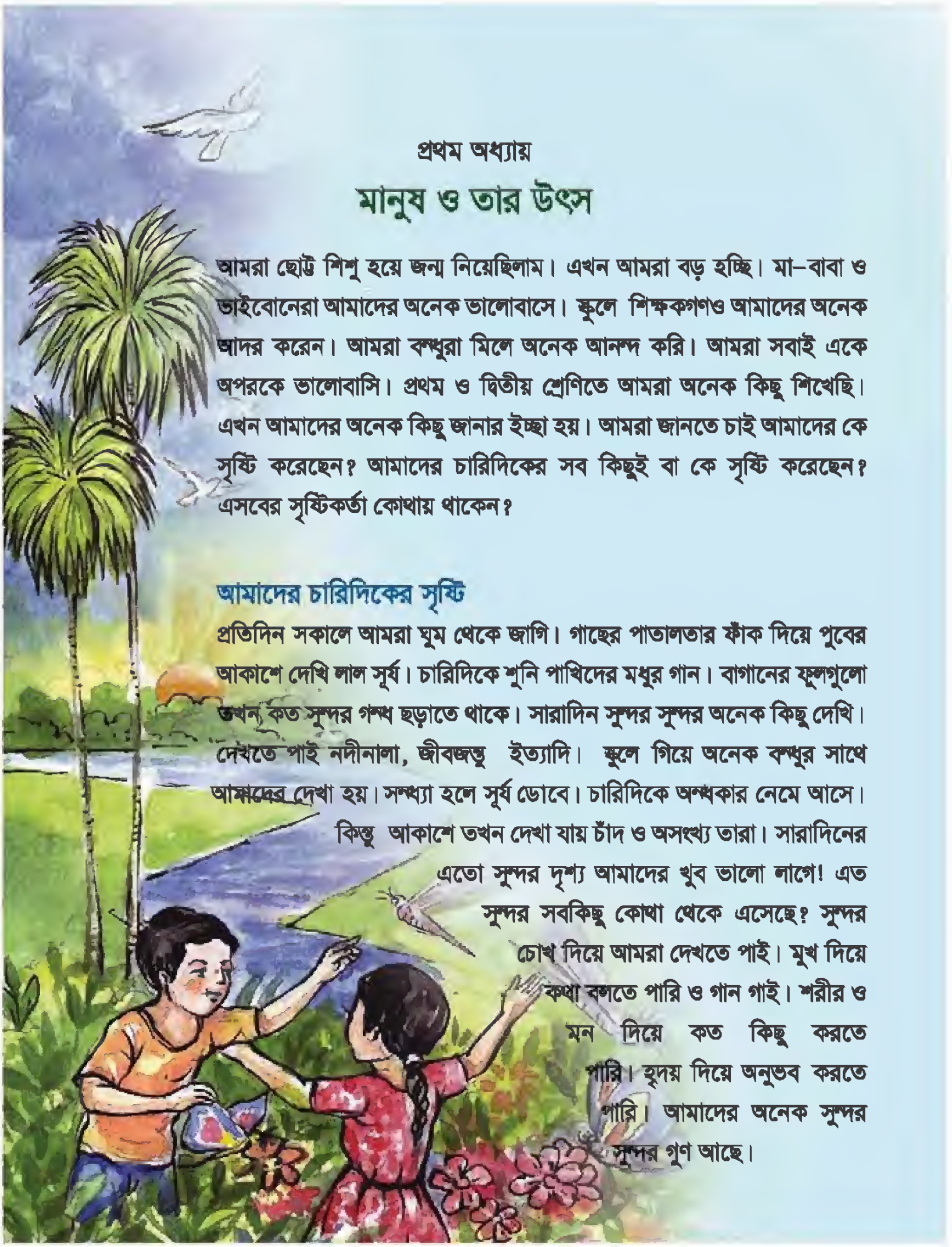

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও তার উৎস

আমরা ছোট্ট শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। এখন আমরা বড় হচ্ছি। মা–বাবা ও ভাইবোনেরা আমাদের অনেক ভালোবাসে। স্কুলে শিক্ষকগণও আমাদের অনেক আদর করেন। আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আনন্দ করি। আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এখন আমাদের অনেক কিছু জানার ইচ্ছা হয়। আমরা জানতে চাই আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের চারিদিকের সব কিছুই বা কে সৃষ্টি করেছেন? এসবের সৃষ্টিকর্তা কোথায় থাকেন?

আমাদের চারিদিকের সৃষ্টি

প্রতিদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে জাগি। গাছের পাতালতার ফাঁক দিয়ে পুবের আকাশে দেখি লাল সূর্য। চারিদিকে শুনি পাখিদের মধুর গান। বাগানের ফুলগুলো তখন কত সুন্দর গন্ধ ছড়াতে থাকে। সারাদিন সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু দেখি। দেখতে পাই নদীনালা, জীবজন্তু ইত্যাদি। স্কুলে গিয়ে অনেক বন্ধুর সাথে আমাদের দেখা হয়। সন্ধ্যা হলে সূর্য ডোবে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু আকাশে তখন দেখা যায় চাঁদ ও অসংখ্য তারা। সারাদিনের এতো সুন্দর দৃশ্য আমাদের খুব ভালো লাগে! এত সুন্দর সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? সুন্দর চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই। মুখ দিয়ে কথা বলতে পারি ও গান গাই। শরীর ও মন দিয়ে কত কিছু করতে পারি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে।

আমাদের মতো করে আমাদের মা–বাবা, ভাইবোন ও অন্য সকলেরও ভালো ভালো গুণ আছে। আমাদের বন্ধুরাও অনেক ভালো। আমাদেরকে এ সব কিছু কে দিয়েছেন? আমরা কোথা থেকে এলাম?

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা

আমাদের মনের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা পেতে পারি ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর কথাগুলো বলেছেন। পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল থেকে আমরা আমাদের মনের প্রশ্নের উত্তর পাই। এখান থেকে আমরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারি। চারিদিকে সৃষ্টির সম্পর্কেও আমরা বাইবেল থেকেই জানতে পারি। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ঈশ্বর জগতের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আকাশ, বাতাস, সূর্য, চাঁদ, তারা সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু , নদীনালা, সাগর ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর হলেন সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

পবিত্র বাইবেল পাঠ

ঈশ্বর সব কিছুর উৎস

কোনো কিছুর জন্মস্থানকে উৎস বলা যায়। যেমন, ঝর্ণার উৎস হলো পাহাড়। কিন্তু এই পাহাড়ের জন্ম হয়েছে ঈশ্বরের আদেশে। তিনি শুধু আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে। সেই জন্য ঈশ্বর ঝর্ণার এবং পাহাড়েরও উৎস। আমরা চারিদিকে যা–কিছু দেখি, সব কিছুরই উৎস তিনি। তিনি আমাদের জীবনেরও উৎস। সব সৃষ্টির মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই।

ঝর্ণার উৎস হলো পাহাড়

ঈশ্বরের প্রশংসা

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব সৃষ্টির উৎস। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তাই আমরা গানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রশংসা করি।

আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার
ভাবি যখন বারে বার.....
মুগ্ধ নয়নে হেরিয়া তাহা
জুড়ায় প্রাণ আমার
আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ভাবি
যখন বারে বার.....

পরিকল্পিত কাজ: চারিদিকে যাকিছু দেখ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর ..... মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেন।
খ। সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন .....।
গ। কোন কিছুর জন্মস্থানকে ..... বলা হয়।
ঘ। পাহাড় হলো ..... উৎস।
ঙ। সব সৃষ্টির উৎস হলেন .....।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। শিক্ষকগণ আমাদের	ক। গুণ আছে।
খ। আকাশে দেখা যায়	খ। আকাশে দেখা যায়
গ। আমাদের অনেক সুন্দর	গ। অনেক আদর করেন।
ঘ। জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন	ঘ। উৎস।
ঙ। ঈশ্বর আমাদের	ঙ। চাঁদ ও অসংখ্য তারা।
	চ। ঈশ্বর।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা একে অপরের জন্য কী করি?

(ক) নিন্দা করি (খ) প্রশংসা করি (গ) ভালোবাসি (ঘ) ঘৃণা করি।

৩.২ আমাদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর গুণ কে দিয়েছেন?

(ক) বাবা–মা (খ) ঈশ্বর (গ) শিক্ষক (ঘ) আত্মীয়স্বজন

৩.৩ আমাদের বন্ধুরা কেমন?

(ক) ভালো (খ) মন্দ (গ) অসৎ (ঘ) সুন্দর

৩.৪ ঈশ্বরের কথাগুলো কোথায় লেখা আছে?

(ক) গল্পের বইতে (খ) ডায়েরিতে (গ) বাইবেলে (ঘ) খাতায়

৩.৫ ঝর্ণার উৎস কী?

(ক) খালবিল (খ) পাহাড় (গ) নদীনালা (ঘ) সাগর।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। এ জগত দেখতে কেমন?

খ। সৃষ্টির সেরা জীব কী?

গ। সৃষ্টির কাহিনি কোথায় লেখা আছে?

ঘ। সব কিছুর উৎস কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। আমরা চারিদিকে কী কী দেখতে পাই?

খ। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কাজের বর্ণনা দাও।

গ। আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করব?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা জেনেছি ঈশ্বর সব সৃষ্টির উৎস। আমরা ঈশ্বরের খুব কাছে থাকি। পানিতে যেমন করে মাছ সাঁতার কাটে আমরাও তেমনি তাঁর মধ্যে ডুবে রয়েছি। তবুও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। তাঁর সাথে আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সারাবিশ্ব জুড়ে আছেন। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের অন্তরে তিনি আছেন।

মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ। তাঁর দয়া ছাড়া কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না। তিনি সবকিছু করতে পারেন।

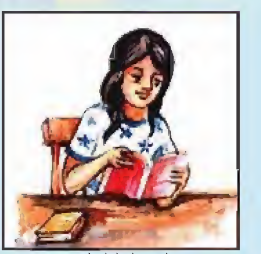

পড়াশুনা করা

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।
কারণ সবার মধ্যে তিনিই বুদ্ধি দেন।

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি দয়ালু। তিনিই সব মানুষের অন্তরে দয়া দেন।

দয়া করা

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। কারণ সকলের অন্তরে তিনিই ক্ষমা করার মনোভাব দেন।

ক্ষমা করা

ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। কারণ সকলের অন্তরে তিনি ভালোবাসা দেন।

ভালোবাসা

মৃত্যু যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তেমনি তিনি বাঁচিয়েও তুলতে পারেন। ঈশ্বর জীবনদাতা।

সবকিছুর মধ্যে তিনিই জীবন দেন।

নতুন জীবন

সব কিছু ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলে। পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়–পর্বত, নদীনালা, সাগর, চাঁদ, তারা, সূর্য, আকাশ, বাতাস, সবই তাঁর আদেশে চলে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সবার মধ্যে আত্মা দিয়েছেন। বিবেক দ্বারা ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। ক্ষমা নেওয়া ও দেওয়ার মনোভাব দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বুদ্ধি দেন। নতুন নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান দেন। তাঁর কাছ থেকেই পাই ধৈর্য ও লোভ জয় করার শক্তি। আমাদের মনের সব কথাও তিনি জানেন। তাঁর শক্তি ও গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। তাই আমরা বলি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন

ধর্মশিক্ষা ক্লাসে একদিন শিক্ষক সব শিক্ষার্থীদের হাতে একটা করে লজেন্স দিলেন। তিনি বললেন: এই লজেন্সটি আজকে এমন জায়গায় গিয়ে খাবে যেখানে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। পরদিন ক্লাসে তিনি জানতে চাইলেন, কে কে লজেন্সটা খেয়েছে। বাবলু ছাড়া সবাই

বললো তারা লজেন্স খেয়েছে। শিক্ষক জানতে চাইলেন, কেন সে লজেন্সটি খায় নি। বাবলু বললো, এমন কোনো জায়গা সে খুঁজে পায় নি যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না। এতে সব শিক্ষার্থী অবাক হয়ে গেল। তখন সে বললো, সব জায়গায় ঈশ্বর আছেন। তিনি সব দেখেন। সে ঐ লজেন্স খাওয়ার জন্য এমন কোনো স্থান পেলো না, যেখানে কেউ দেখতে পায় না। শিক্ষক বাবলুর কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। তিনি সবকিছু দেখেন।

ঈশ্বর নিরাকার

ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর কোন আকার নেই। অদৃশ্য আত্মা হয়েও তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের ভালোবাসেন। যেমন, বাতাস না থাকলে আমরা বাঁচি না। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু কোনো কিছুই বাতাস ছাড়া বাঁচে না। এই বাতাস আমরা দেখি না, কিন্তু সারা জগৎ জুড়েই আছে। ঈশ্বরকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি সব জায়গায় আছেন।

কী শিখলাম

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছু জানেন, দেখেন ও করতে পারেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

পরিকল্পিত কাজ: এমন দশটি কাজের নাম লেখ যা ঈশ্বর করতে পারেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর ..... এবং সারাবিশ্ব জুড়ে আছেন।
খ। সকল সৃষ্টির সেরা হলো.....।
গ। ঈশ্বরের ..... ছাড়া কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না।
ঘ। ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ..... । তাই তিনি সবাইকে বুদ্ধি দেন।
ঙ। ঈশ্বর দয়ালু, তাই তিনি মানুষের অন্তরে ..... দেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। ঈশ্বর জীবনদাতা	ক। বিবেকের দ্বারা।
খ। ঈশ্বর সবার অন্তরে ভালোবাসা দেন,	খ। ঈশ্বর ।
গ। সবকিছু নিয়ম মেনে চলে	গ। সবকিছুতে তিনি জীবন দেন।
ঘ। ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা পাই	ঘ। ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা ।
ঙ। আমাদের মনের সব কথা জানেন	ঙ। ক্ষমাশীল।
	চ। ঈশ্বরের দ্বারা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বরের আকার কেমন?

(ক) গোলাকার (খ) নিরাকার (গ) ত্রিকোণাকৃতি (ঘ) ডিম্বাকৃতি

৩.২ বিশ্বের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?

(ক) মানুষ (খ) যীশু (গ) পিতা ঈশ্বর (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৩ কী না পেলে আমরা বাঁচি না?

(ক) বাতাস (খ) ঝড় (গ) গাছপালা (ঘ) বন্যা

৩.৪ সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সৃষ্টি কী?

(ক) গাছপালা (খ) পাহাড়পর্বত (গ) সমুদ্রের পানি (ঘ) মানুষ

৩.৫ নতুন নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের কী দেন?

(ক) জ্ঞান (খ) বিবেক (গ) ক্ষমার মনোভাব (ঘ) বুদ্ধি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মানুষ কার মধ্যে ডুবে থাকে ?

খ। ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

গ। ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন?

ঘ। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিবেক দেন কেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কাজগুলো কী কী?

খ। ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজের বর্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

শৈশব থেকেই আমরা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে শুরু করি। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে জানতে থাকি। তবুও যেন ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জানা শেষ হয় না। 'ত্রিব্যক্তি' কথার অর্থ তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা–এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। এই বিষয়টি হলো একটি রহস্য। এটি আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। অনেকখানি অজানা থাকে। পুরোপুরি না জানলেও ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি।

ঈশ্বর একজন

আমরা জানি, ঈশ্বর শুধু আত্মা। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না বলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতেও পারি না। তাই তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য পাঠালেন। পুত্র ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারলাম। পিতা ও পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে জানতে পারলাম। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, ঈশ্বর এক।

তিন ব্যক্তি সমান

তিন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। কেউ বড় বা কেউ ছোট নন। তিন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে এক। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি আলাদা নন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এক। পিতা সৃষ্টিকাজ করেন। সৃষ্টির সময় পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের সাথে ছিলেন।

পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুত্র ঈশ্বর এসেছেন। পুত্র ঈশ্বর মুক্তি কাজ সম্পন্ন করেন। মুক্তি কাজের সময় পিতা ও পবিত্র আত্মা পুত্রের সঙ্গে ছিলেন। পিতা ও পুত্র থেকে পবিত্র আত্মা আসেন। তিনি এখন আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের সহায়ক তিনি। তাঁর সকল কাজে পিতা ও পুত্র রয়েছেন। এভাবে আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এক ঈশ্বরের উপাসনা করি।

তিনে মিলে এক

তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর

পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের কাছে একটি গভীর রহস্য। কী করে ঈশ্বর মাত্র একজন, অথচ তিন ব্যক্তি হতে পারেন? একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারি। যেমন একটি দ্রাক্ষাগাছের মূল কাণ্ড একটা, কিন্তু এর অনেক ডালপালা আছে। সবগুলো ডালপালার গুরুত্ব সমান। সবগুলো অংশ মিলে একটি গাছ হয়। সব ডালপালা মিলে গাছের ফল উৎপাদন করে ও আমাদের জন্য সুস্বাদু ফল দেয়।

কী শিখলাম

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিন ব্যক্তি। পিতা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, পুত্র ঈশ্বর মুক্তি আনেন এবং পবিত্র আত্মা অনুপ্রেরণা দেন, সহায়তা করেন ও আমাদের মধ্যে বাস করেন। আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করি।

পরিকল্পিত কাজ: ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি কে কে এবং কে কী তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। এক ঈশ্বরে ..... ব্যক্তি আছেন ।

খ। ত্রিব্যক্তি কথার অর্থ .....।

গ। পুত্র ঈশ্বর ..... কাজ করেন।

ঘ। পবিত্র আত্মা আমাদের ..... দেন ।

ঙ। আমরা এক ঈশ্বরের ..... করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। এক ঈশ্বরে	ক। পিতা ঈশ্বর।
খ। সৃষ্টির কাজ করেন	খ। পুত্র।
গ। আমাদের মধ্যে বাস করেন।	গ। তিন ব্যক্তি
ঘ। পিতা ও পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি	ঘ। সন্তান।
	ঙ। পবিত্র আত্মাকে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ এক ঈশ্বরে কতজন ব্যক্তি আছেন?

(ক) একজন (খ) দুইজন (গ) তিনজন (ঘ) চারজন

৩.২ পুত্রকে জানার পথ হলো:

(ক) মানুষ (খ) স্বর্গের দূতবৃন্দ (গ) স্বর্গীয় পিতা (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৩ পিতা ঈশ্বরকে কে প্রকাশ করেন?

(ক) পিতা (খ) পুত্র (গ) পবিত্র আত্মা (ঘ) ত্রিব্যক্তি

৩.৪ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই–

(ক) ছোট–বড় (খ) আলাদা (গ) যার যার মতো (ঘ) সমান

৩.৫ পবিত্র আত্মা কী হিসেবে কাজ করেন?

(ক) সৃষ্টিকর্তা (খ) অনুপ্রেরণাদাতা (গ) জীবনদাতা (ঘ) মুক্তিদাতা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। 'ত্রিব্যক্তি' কথার অর্থ কী?

খ। সৃষ্টির কাজ কে করেন?

গ। পুত্রের কাজ কী?

ঘ। আমাদের সহায়ক কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ত্রিব্যক্তি কীভাবে সমান?

খ। ত্রিব্যক্তি মিলে কীভাবে এক ঈশ্বর?

চতুর্থ অধ্যায়

শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত শয়তান

পৃথিবীতে আমরা সবাই সুখে বাস করতে চাই। আমরা চাই শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, নিরাপত্তা ও এরকম ভালো অবস্থা। কিন্তু সমাজে দেখি এগুলোর কত অভাব। চারিদিকে দেখি অনেক অশান্তি, অন্যায়-অত্যাচার, ঘৃণা, ঝগড়াবিবাদ, নিরাপত্তাহীনতা, বিনা কারণে দুঃখকষ্ট ইত্যাদি। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, একের পর এক মন্দতা কোথা থেকে আসে? কেন এগুলো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না? এগুলোর উত্তর পেতে হলে আমাদের পাঠ করতে হবে পবিত্র বাইবেল। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, এসব দুঃখকষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো শয়তান। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শয়তান নানা রকম ফন্দি আঁটছে। সে আমাদেরকে নানা রকম প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে। এত প্রলোভনের মধ্যে আমাদের মন খুব শক্ত রাখতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। সেই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রতিদিনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কার পরামর্শ শুনবো-ঈশ্বরের নাকি শয়তানের?

শয়তানের পরিচয়

যাকে আমরা শয়তান বলি তার আর এক নাম হলো দিয়াবল। সে এবং তার অনুসারীরা আগে অন্য স্বর্গদূতদের মতোই ভালো স্বর্গদূত ছিল। তারাও অন্য স্বর্গদূতদের মতো আগে সর্বদা ঈশ্বরের

আরাধনা করত। কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে ঈর্ষা হলো। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তারা পাপ করল। সেই পাপের পর থেকে তাদেরকে শয়তান বা দিয়াবল বলে ডাকা হয়। সাধু যোহন শয়তানের নাম দিয়েছেন নাগদানব। কারণ তিনি স্বর্গের একটি দৃশ্যের মধ্যে ঐ নাগদানবটিকে দেখতে পেয়েছেন। তার সাতটি মাথা আর দশটি শিং ছিল। সে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ

সেই নাগদানব অর্থাৎ শয়তান ও তার সঙ্গীদের মধ্যে অহংকার প্রবেশ করল। তারা গর্বিত হয়ে উঠল। ঈশ্বরের রাজত্ব গ্রহণ না করে তারা বিদ্রোহ করলো। তারপর স্বর্গে একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল। মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী সেই নাগদানব বা শয়তান ও তার দলের সাথে যুদ্ধ করলেন। নাগদানব বা শয়তান ও তার অপদূত–বাহিনী নিয়ে মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত শয়তান ও তার দল পরাজিত হলো। স্বর্গে তাদের আর থাকতে দেওয়া হলো না। সেখান থেকে তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো নরকে।

শয়তানদের শাস্তি

পরাজিত শয়তান ও তার সঙ্গীদের ঈশ্বর অনুতাপের কোন সুযোগ দিলেন না। কারণ তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা এই অপরাধ করেছে। ঈশ্বর তাদের মহাশাস্তির ব্যবস্থা করলেন। শয়তানদের জন্য ঈশ্বর একটি নরক সৃষ্টি করলেন। এটি এমন একটি স্থান যেখানে সব সময় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এই আগুন কখনও নিভে না। ঈশ্বর তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করলেন। শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের আগুনে সারা জীবন পুড়তে থাকল।

নাগদানব

শয়তানের কাজ চলছে

শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সব সময় কাজ করে চলছে। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তানেরা সারা জগতটাকে ভোলায়। সে সবরকম মিথ্যার জন্ম দেয় এবং দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তারা

মানুষকে পাপে ফেলার জন্য সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রথমে তারা হবাকে ও পরে আদমকে পাপে ফেলেছে। যীশুকে শত চেষ্টা করেও শয়তান পাপে ফেলতে পারে নি। যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সব সময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোন কোন মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সব সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সব সময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোন কোন মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সব সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর।

শয়তানকে পরাজিত করতে হবে

প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছেন শয়তানের কাজগুলোকে ধ্বংস করে দিতে। যীশু তাঁর কাজ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সফল করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেন, "আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম" (লুক ১০:১৮)। মরুভূমিতে শয়তান যীশুকে প্রলোভন দিতে এসেছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'দূর হও শয়তান'। তখন শয়তান যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আমরা যদি শয়তানকে পরাজিত করতে চাই, তবে আমাদেরও যীশুর মতো কাজ করতে হবে। আমরাও প্রলোভনের সময় শয়তানকে বলতে পারি, 'দূর হও শয়তান'। তখন শয়তান আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

নৈতিক শিক্ষা

শয়তানের কাজ	ঈশ্বরের কাজ
অহংকার করা	অহংকার করা
ঈশ্বরের বিরোধিতা করা	ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া
অন্যকে ভুল পথে চালিত করা	সঠিক পথে চালিত করা
দলাদলি করা	একতা আনা
অশান্তি সৃষ্টি করা	শান্তি স্থাপন করা
মিথ্যার জন্ম দেওয়া	সত্য প্রতিষ্ঠা করা

কী শিখলাম

শয়তানের পরাজয়ের কারণ হলো অহংকার ও গর্ব। পরাজয়ের ফলে শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের শাস্তি ভোগ করছে। চিরদিন তারা পুড়বে ও কষ্ট পাবে। তার মধ্যেই মিথ্যার জন্ম। যারা তার অনুসরণ করে তারা শয়তানের বংশধর। কিন্তু যারা যীশুর পথে চলে তারা ঈশ্বরের সন্তান।

পরিকল্পিত কাজ শয়তানের পাঁচটি কাজ লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। দুঃখ কষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো..... ।

খ। পৃথিবীতে সবাই ..... বাস করতে চাই।

গ। শয়তানের অপর নাম.....।

ঘ। প্রলোভনের মধ্যেও আমাদের মন ..... রাখতে হবে।

ঙ। শয়তান সর্বদা আমাদের নানারকম ..... ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা শয়তান	ক। নাগদানব।
খ। সাধু যোহন শয়তানের নাম দেন	খ। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ।
গ। শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সব সময় কাজ করে	গ। পাপ করল।
ঘ। শয়তানের জন্য ঈশ্বর	ঘ। প্রতিশোধ নেবার জন্য ।
ঙ। যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা	ঙ। নরক সৃষ্টি করলেন।
	চ। পাপে ফেলতে পারে নি।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কাদের জন্য মহাশাস্তির ব্যবস্থা করেন?

(ক) মানুষের (খ) শয়তানের

(গ) যীশুর (ঘ) শিষ্যদের

৩.২ শয়তান ও তার সঙ্গীরা কীসের আগুনে সারা জীবন পুড়তে থাকল?

(ক) স্বর্গের (খ) মধ্যস্থানের

(গ) পাতালের (ঘ) নরকের

৩.৩ শয়তান যীশুকে কোথায় প্রলোভন দিতে এসেছিল?

(ক) মরুভূমিতে (খ) পাহাড়ে

(গ) মাঠে (ঘ) মন্দিরে

৩.৪ শয়তানের পরাজয়ের কারণ কী?

(ক) অহংকার ও গর্ব (খ) হিংসা ও রাগ

(গ) মিথ্যা ও দুর্নাম (ঘ) মিথ্যা ও রাগ

৩.৫ কারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে?

(ক) বিশ্বাসে সবল যারা (খ) মিথ্যাবাদী যারা

(গ) বিশ্বাসে দুর্বল যারা (ঘ) শারীরিকভাবে দুর্বল যারা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে কী বলা হয়েছে ?

খ। শয়তানের বংশধর কারা ?

গ। মরুভূমিতে শয়তানকে যীশু কী বলেছিলেন?

ঘ। কারা নরকের আগুনে সারা জীবন পুড়বে ?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কাজগুলো কী কী?

খ। পরাজিত শয়তানদের ঈশ্বর কীরূপ শাস্তি দিলেন?

গ। শয়তানকে পরাজিত করার জন্য যীশু আমাদের কী করতে বলেন?

ঘ। শয়তানের পরিচয় কী?

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

'বাইবেল' শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল অর্থ হচ্ছে বইপুস্তক। একটা লাইব্রেরিতে যেমন অনেক বই থাকে, তেমনি বাইবেলও একটা লাইব্রেরির মতো। কারণ অনেকগুলো ছোট–বড় পুস্তক নিয়ে হলো বাইবেল। এখন আমরা যে ধরনের বই দেখি বা ব্যবহার করি, আগের দিনে সেরকম ছিল না। তখনও কাগজ আবিষ্কার হয় নি। তখন বই লেখা হতো চামড়া অথবা পাতার উপর। পুরো বইটা হাত দিয়ে লেখা হতো। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছিল চামড়ার উপর।

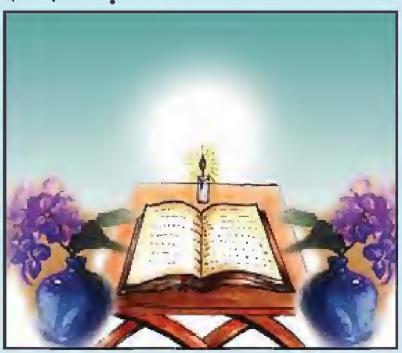

পবিত্র বাইবেল

বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী

পবিত্র বাইবেল হলো খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী বা কথা। ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারি। কীভাবে তিনি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন তা জানতে পারি। তাঁর ইচ্ছা জেনে পাপের পথ ত্যাগ করে পবিত্রতার পথে চলতে পারি। পৃথিবীতে নানা রকম মন্দতা থাকলেও আমরা যেন আশা না হারাই। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের কথাগুলো আমরা অবশ্যই ভক্তি সহকারে পাঠ করব, গ্রহণ করব ও মেনে চলব।

বাইবেল একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

ঈশ্বর পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। বাইবেল হলো সেই পবিত্র ঈশ্বরের কথা। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই পবিত্র। যুগের পর যুগ পবিত্র ঈশ্বর কীভাবে মানব জাতিকে ভালোবাসলেন, তাই বাইবেলে লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলকে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা করি।

যেমন মা–বাবা ও অন্যান্য গুরুজনের কথা মেনে চলার মাধ্যমে তাঁদেরকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তেমনিভাবে পবিত্র বাইবেলের বাণী অনুযায়ী জীবন যাপন করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাইবেল পাঠ

পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ প্রার্থনা করা। আর প্রার্থনা করার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। আমরা যখন পবিত্র বাইবেলের সামনে বসি তখন যেন মনে রাখি, আমরা ঈশ্বরের সামনেই বসে আছি। যখন বাইবেলের বাণী শুনি তখন ঈশ্বরের বাণী শুনি। বাইবেলের কথাগুলো শুধু মুখস্থ করলে বা মানুষকে শোনাতে পারলেই যথেষ্ট নয়। অথবা বাইবেলকে যত্ন সহকারে আলমারীতে বা সেলফে রেখে দিলেও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে সেই অনুসারে জীবন যাপন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবনে মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। এজন্য বাইবেল পাঠের পর নীরবে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করতে হয়। ঈশ্বরের কথা শোনার চেষ্টা করতে হয়। এভাবে আমরা আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি বুঝতে ও তাঁর ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি।

বাবা সকলকে বাইবেল পাঠ করে শোনাচ্ছেন

কী শিখলাম

অনেকগুলো পুস্তক নিয়ে বাইবেল। বাইবেল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল হলো ঈশ্বরের কথা, আমাদের মুক্তির ইতিহাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের সামনে বাইবেল পাঠ করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ

১। একটি বাইবেলের একপাশে জলন্ত মোমবাতি অন্যপাশে একটি ক্রুশের ছবি খাতায় অঙ্কন কর।

২। গান গাও: বাইবেল, বাইবেল,বাইবেল/ পবিত্র এই বাইবেল . . . .

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। বাইবেল কথাটি ..... ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ। বাইবেল হলো একটি ..... মতো।

গ। খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো ..... ।

ঘ। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই .....।

ঙ। বাইবেল হলো ..... ইতিহাস।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	ক। চামড়ার উপর।
খ। বাইবেল একটা	খ। বাইবেল।
গ। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছে	গ। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে।
ঘ। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা	ঘ। লাইব্রেরির মতো।
	ঙ। বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ বাইবেল কেমন ধর্মগ্রন্থ?

(ক) পবিত্র (খ) সাধারণ

(গ) অসাধারণ (ঘ) বিশেষ

৩.২ আগের দিনে বই কোথায় লেখা হতো?

(ক) পাথরের উপর (খ) কাগজের উপর

(গ) চামড়ার উপর (ঘ) পাতার উপর

৩.৩ ঈশ্বর কার মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেছেন?

(ক) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে (খ) সরকারের মাধ্যমে

(গ) দূতদের মাধ্যমে (ঘ) প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে

৩.৪ ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে মানুষ কার ইচ্ছা জানতে পারে?

(ক) শয়তানের (খ) দিয়াবলের

(গ) ঈশ্বরের (ঘ) মানুষের

৩.৫ পবিত্র বাইবেলের বাণী কীভাবে পাঠ করব?

(ক) অপবিত্রভাবে (খ) ভক্তিসহকারে

(গ) সাধারণভাবে (ঘ) অসাধারণভাবে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কী?

খ। বাইবেলে কী লেখা আছে?

গ। কেমন করে বাইবেল পাঠ করতে হয়?

ঘ। প্রার্থনা করার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কাকে বলে?

খ। বাইবেল ঈশ্বরের বাণী, তুমি কীভাবে বুঝবে?

গ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বাইবেলের গুরুত্ব কতটুকু?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তাই তিনি চান আমরা যেন প্রকৃত সুখী মানুষ হই। তিনি আমাদের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। এগুলো পালন করলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। এভাবে আমরা সুখী জীবন যাপন করতে পারি। আগের শ্রেণিতে আমরা ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা ধীরে ধীরে আজ্ঞাগুলোর অর্থ জানব। প্রথমে আমরা জেনে নিব ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ। ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বলেন: "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে।"

সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।
২। ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না।
৩। বিশ্রামবার (রবিবার) বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।
৪। পিতামাতাকে সম্মান করবে।
৫। নরহত্যা করবে না।
৬। ব্যভিচার করবে না।
৭। চুরি করবে না।
৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
৯। পরস্ত্রী/পরপুরুষে লোভ করবে না।
১০। পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

প্রথম আজ্ঞা: তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।

প্রথম আজ্ঞার অর্থ: প্রভু ঈশ্বর আমাদের জন্য এই আজ্ঞাটি দিয়েছেন, আমরা যেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। আমরা যেন স্বীকার করি তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কখনও তাঁর পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান। তাঁর মধ্যে কোন মন্দতা নেই। তাই তিনি চান আমরা যেন তাঁর বাণী গ্রহণ করি। তাঁর উপর যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। সব সময় যেন স্বীকার করি যে, তিনি সব কিছুর কর্তা, সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মঙ্গলময়। আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি। তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

ঈশ্বরকে পূজা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করা। ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করার সময় আমরা স্বীকার করি যে, তিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। আরও স্বীকার করি, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, সবকিছুর প্রভু ও কর্তা। আরাধনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

নিজেদেরকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে দান করি। আমরা স্বীকার করি, তিনিই সব কিছুর উৎস। তাঁর মধ্য দিয়েই সব কিছু টিকে আছে। ঈশ্বরের আরাধনা করার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের মহান কাজ স্মরণ করি। মারীয়ার মতো নম্র হই । আমরা স্বীকার করি যে, আমরা তাঁর মতো পবিত্র নই। তাই তাঁর পবিত্রতা স্বীকার করি ও দয়া চাই। ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমেই আমরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি। আমরা আরও বেশি দায়িত্বশীল হই ও তাঁর প্রতি বাধ্য হতে শিখি।

কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করা যায়

১। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে;
২। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে;
৩। তাঁর প্রশংসা করে;
৪। প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনের মাধ্যমে;
৫। ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে;
৬। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবেসে;
৭। দীনদরিদ্রদের সেবা করে;
৮। তাঁর ইচ্ছা পালন করে ও বাধ্য থেকে।

স্বপ্ন ও সমর্পণ দুই ভাইবোন। এক জনের বয়স ১০ অন্য জনের বয়স ৭ বৎসর। তাদের দুইজনেরই রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মায়ের সাথে প্রার্থনা করে। তাদের মা বাইবেল পাঠ করে শোনালে তারা মন দিয়ে শোনে। টিভিতে তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান থাকলেও তারা প্রার্থনা বাদ দেয় না। রবিবার দিন স্কুল খোলা থাকলেও তারা নিয়মিত খ্রিষ্টযাগে যায়। রাস্তায় গরিব দুঃখী মানুষ দেখলে তারা দান করে। উৎসবের সময় বাবামায়ের কাছে বেশি দামী জামাকাপড় দাবি করে না। তারা সবার সাথে মিলেমিশে থাকে। সব বিষয়ে তারা ঈশ্বরের কথামতো চলতে চেষ্টা করে। বিপদে আপদে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখে।

কী শিখলাম

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা যেন সুখী মানুষ হই। তাই তিনি আমাদেরকে দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি চান আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। সব সময় যেন তাঁর আরাধনা করি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা কর? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২। প্রথম আজ্ঞাটি একটি কাগজে সুন্দরভাবে লিখে চারিদিকে ফুলপাতার নকশা অঙ্কন কর। তারপর একটি জায়গায় সাজিয়ে রাখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর আমাদের ..... আজ্ঞা দিয়েছেন।

খ। আরাধনার মাধ্যমে আমরা নিজেকে .....ভাবে দান করি।

গ। ঈশ্বর সবসময় বিশ্বস্ত ও .....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	ক। আমরা সুখী হই।
খ। তিনি চান	খ। ভরসা রাখতে পারি।
গ। ঈশ্বরের উপর আমরা	গ। ও দয়ালু।
	ঘ। আমরা ঠিকমত জীবন যাপন করি।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?

খ। প্রথম আজ্ঞায় ঈশ্বরকে কী করতে বলা হয়েছে?

গ। ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ। কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়

পাপ

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সুখী মানুষ হই। অন্তরে সুখ থাকলেই আমরা সুখী মানুষ হতে পারি। যারা তাঁর মতো পবিত্র হতে চেষ্টা করে তাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক ভালো থাকে। তাঁর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলেই আমরা অন্তরে সুখ অনুভব করি। ঈশ্বর জানেন, আমরা দুর্বল মানুষ। তাই সবসময় আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারি না। অর্থাৎ আমরা পাপ করে থাকি। পাপ করি বলে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্রও হতে পারি না। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি ও পাপ কত প্রকার। আমরা আরও দেখব পাপের ফল কী এবং কীভাবে পাপ না করে চলা যায়।

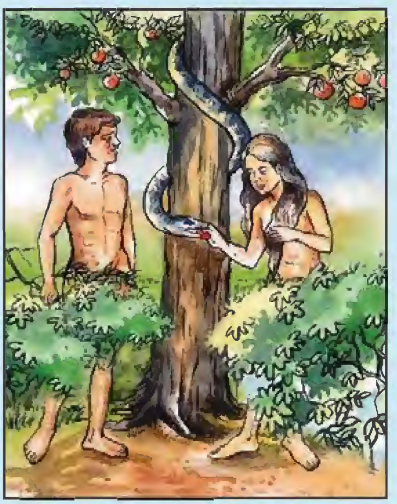

এদেন বাগানে শয়তান হবাকে ফল দিচ্ছে

পাপ কী

আমাদের মা–বাবা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন কাজের বা ভালো পথে চলার আদেশ দেন। তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের ভালো চান। আমরা তাঁদের আদেশগুলো পালন করলে তাঁরা খুশি হন। আর পালন না করলে তাঁরা দুঃখ পান। ঈশ্বর আমাদের পিতা। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি আমাদেরকে যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন সেগুলো আমরা জানি। আজ্ঞাগুলো জেনেও যখন আমরা সেগুলো অমান্য করি, তখনই আমরা পাপ করি। তাহলে বলতে পারি: জেনে শুনে নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করাই হলো পাপ। চিন্তা, কথা ও কাজ দিয়ে আমরা অনেক সময় তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করি।

পাপের প্রকারভেদ

পাপ দুই প্রকার: মৌলিক পাপ ও স্বকৃত পাপ।

১। মৌলিক পাপ: আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবা এদেন বাগানে সুখে বাস করছিলেন। ঈশ্বর তাঁদেরকে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে শয়তানের কথা শুনে সেই ফল খেয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। এই অবাধ্যতা তাঁদের প্রথম পাপ। তাঁদের এই পাপটিকে বলা হয় মৌলিক পাপ। তাঁদের পাপের পর থেকে সব মানুষ আত্মায় মৌলিক পাপের দাগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এই পাপ আমরা জেনেশুনে বা নিজের ইচ্ছায় করি না। দীক্ষাস্নানের দ্বারা এই পাপ আমাদের আত্মা থেকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২। স্বকৃত পাপ: আমরা নিজের ইচ্ছায়, জেনেশুনে যে পাপ করি তাকে বলা হয় স্বকৃত পাপ। যেমন, আমরা জানি সপ্তম আজ্ঞায় আছে, চুরি করবে না। তা জেনেও আমরা যখন কারও জিনিস চুরি করি, তখন আমরা পাপ করি। কারণ এই পাপ আমরা জেনেশুনে ও নিজের ইচ্ছায় করি। অনুতাপ ও পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা এই পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা

ছোট ছেলে দূর দেশে চলে যাচ্ছে

যীশু একদিন একটি গল্প বললেন:

এক লোকের দুইটি ছেলে ছিল। একদিন ছোট ছেলেটি বাবাকে বলল, 'বাবা! আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও।' বাবা তাকে তার ভাগের সম্পত্তি দিয়ে দিলেন। বাবার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি সব বিক্রি করে টাকাপয়সা নিয়ে ছেলেটি দূর দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে মন্দভাবে জীবন যাপন করতে লাগল। সব টাকা পয়সা মন্দ আমোদ–প্রমোদ করে নষ্ট করল। তখন ঐ দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে খুব অভাবে ও কষ্টে পড়লো। ক্ষুধার জ্বালায় সে এক বাড়িতে শূকর চড়াবার কাজ নিল। সেখানেও সে ঠিকমত খেতে পেত না। শূকরের খাবার খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত। এমন

সময় তার বাবার ভালোবাসার কথা তার মনে পড়ল। তার বাবার বাড়িতে কত লোক কত বেশি খাবার পাচ্ছে। আর সে কি–না ক্ষুধার জ্বালায় মরছে! তখন সে ঠিক করল যে, সে বাবার কাছে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চাবে। সে যা ভাবল তাই করল।

ছোট ছেলে শূকরের খাবার খাচ্ছে

ছোট ছেলে বাবার কাছে ফিরে এসেছে

সে বাবার কাছে ফিরে আসল। বাবা তাকে ক্ষমা করলেন। তাকে ফিরে পেয়ে বাবা খুব খুশি হলেন ও তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে দামি জামা কাপড় পরালেন। তার হাতে আংটি দিলেন। তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উৎসব করতে লাগলেন।

নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতা	অনৈতিকতা
বাধ্যতা	অবাধ্যতা
সম্পদ রক্ষা করা	সম্পদ অপচয় করা
সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করা	খারাপ জীবন যাপন করা
ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা	খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা

পাপের ফল

১। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়;

২। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়;

৩। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়;

৪। আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারি না;
৫। আমরা নরকে যাওয়ার যোগ্য হই;
৬। চিরকাল সুখে থাকার যোগ্যতা হারাই;

পাপ পরিহার করার উপায়

১। পাপ সর্ম্পকে সচেতন হওয়া।
২। পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
৩। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা।
৫। প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা।
৬। ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝা ও মেনে চলা।
৭। পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করা।
৮। নিয়মিত প্রার্থনা করা।
৯। নিজের দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র রাখার চেষ্টা করা।

কী শিখলাম

পাপ কী, মৌলিক পাপ কী, স্বকৃত পাপ কী তা জেনেছি। পাপের ফলে কী হয় এবং কীভাবে পাপ ত্যাগ করতে পারি, সে বিষয়ে বুঝেছি। নৈতিক জীবন গঠনের চেতনাও লাভ করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। হারানো পুত্রের গল্পটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয় কর।
২। একসঙ্গে নিচের প্রার্থনাটি বলো। প্রার্থনাটি মুখস্থ কর।
প্রার্থনা: হে প্রভু যীশু, তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা কর। পাপ না করার শক্তি দান কর। আমাকে তোমার কৃপা দান কর। আমি যেন পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। আমেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। পাপ করে আমরা .....কে দুঃখ দেই।
খ। অনুতাপ ও ..... মাধ্যমে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়ে থাকি।
গ। পাপের ফলে আমরা..... যোগ্য হই।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। পাপের ফলে	ক। মানুষকে ক্ষমা করেন।
খ। পাপ পরিহারের উপায় হলো	খ। মৌলিক পাপ মুছে যায়।
গ। মানুষ বার বার পাপ করলেও ঈশ্বর	গ। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়।
ঘ। দীক্ষাস্নানের দ্বারা	ঘ। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
	ঙ। নিয়মিত দান করা।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে যে পাপ করি তাকে বলে

(ক) মৌলিক পাপ (খ) আদি পাপ (গ) স্বকৃত পাপ (ঘ) মারাত্মক পাপ

৩.২ হারানো পুত্র ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা কোনটি

(ক) দয়া করা (খ) ক্ষমা করা (গ) সেবা করা (ঘ) ভালো ব্যবহার করা

৩.৩ পাপের ফল কোনটি

(ক) অশান্তি (খ) উন্নতি (গ) ঈশ্বরের কৃপা (ঘ) মানুষের ভালোবাসা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপ কী?

খ। পাপ কত প্রকার ও কী কী?

গ। মৌলিক পাপ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপের পাঁচটি ফল লেখ।

খ। পাপ পরিহারের পাঁচটি উপায় লেখ।

গ। হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতা গল্পের নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলো বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতার জন্ম

আদি পিতামাতার পাপের ফলে সকল মানুষ পাপের কারাগারে বন্দী ছিল। যীশু খ্রিষ্ট মানুষকে মুক্ত করলেন। তাই তিনি হলেন আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি পুরো মানবজাতির মুক্তিদাতা। মুক্তিদাতা যীশুর জন্মদিনকে আমরা বড়দিন বলি। বড়দিনে আমরা সবাই মিলে অনেক আনন্দ করি। তাঁর জন্মের সময় কিছু কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন মানুষ তাঁকে প্রণাম করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। মুক্তিদাতাকে আমরা কোথায় দেখতে পাব, কীভাবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারব, সে বিষয়ে আমরা এখন পাঠ করব।

গোয়াল ঘরে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম

মুক্তিদাতার জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আমাদের আদি পিতামাতা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলেন। তাঁদের পাপের কারণে সকল মানুষের মধ্যে পাপ প্রবেশ করল। তাঁদের জীবনে নেমে এলো অশান্তি । স্বর্গ ছেড়ে তাঁদের পৃথিবীতে চলে আসতে হলো। স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাঁদের পথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু দয়ালু ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। তাই তাদের জন্য তাঁর অনেক দয়া হলো। ঈশ্বর তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেললেন না। চিরদিন তাদেরকে কষ্টের মধ্যেও রাখতে চাইলেন না। তিনি মানুষকে আবার স্বর্গের সুখ ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, মানুষের মুক্তির জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। ঈশ্বর শয়তানকে বললেন, "সকল জীবজন্তুর মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হবে। তুমি সম্পূর্ণ বুকে ভর দিয়ে চলবে আর ধূলা খেয়ে বাঁচবে। আমি তোমার ও হবার মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তোমার বংশ ও হবার বংশের মধ্যেও শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে। আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।"

মানুষের মুক্তির জন্য এটাই হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি। তাঁর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে হবার বংশেই মুক্তিদাতা যীশু মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। তিনি জন্ম নিয়ে শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করলেন। অর্থাৎ পাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করলেন।

মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য

১। মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করা

২। ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা মানুষের কাছে প্রকাশ করা

৩। মানুষকে ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া

৪। মানুষে মানুষে পুনর্মিলন ঘটানো

৫। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মিলন ঘটানো

মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনা

নাজারেথ নগরে একজন কুমারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মারীয়া। একদিন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে একটি সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন যে, 'তুমি মুক্তিদাতার মা হবে'। এরকম সংবাদে মারীয়া ভয় পেলেন। তিনি জানালেন, 'আমি অবিবাহিতা। এটি কী করে সম্ভব'। তখন স্বর্গদূত বললেন যে, 'ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব'। তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিলেন। তিনি বললেন, 'আমি ঈশ্বরের দাসী। আমার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' এরপর মারীয়া মা হতে চললেন। যীশুর জন্মাবার সময় খুব কাছে এসে গেছে। এমন সময় রোম সম্রাট সিজার একটি আদেশ জারি করলেন। তিনি লোক গণনা করতে চাইলেন। তাই সবাইকে নিজ নিজ শহরে

গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে সংবাদ দিচ্ছেন

গিয়ে নাম লেখাতে বললেন। মারীয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন দায়ূদ বংশের লোক। তিনি নাম লেখাতে গেলেন বেথলেহেম নগরে। সঙ্গে নিলেন মারীয়াকে। সেখানে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য তাঁরা জায়গা খুজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও জায়গা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশ্রয় নিলেন একটি গোয়াল ঘরে। সেখানে ছিল গরু ও ভেড়ার পাল। সে রাতে অনেক শীত ছিল। হাড় কাঁপানো শীতের গভীর রাতে যীশুর জন্ম হলো। মারীয়া যীশুকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন। অতি সাধারণ ও দীন বেশে ঈশ্বর পুত্রের জন্ম হলো। রাজা হয়েও তিনি গরিবের মতোই জন্ম নিলেন।

মুক্তিদাতা যীশুর প্রতি ভক্তি

শীতের রাতে রাখালেরা মাঠে আগুন পোহাচ্ছিল। গভীর রাতে স্বর্গদূত রাখালদের দেখা দিলেন। রাখালেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু স্বর্গদূত তাদেরকে যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ দিলেন। রাখালেরা যীশুকে দেখতে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা নবজাত যীশুকে প্রণাম জানালেন।

পূর্বদেশের পন্ডিতেরা যীশুকে উপহার দিচ্ছেন

সেই সময় আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা দেখা গেল। পূর্বদেশের তিন জন পন্ডিত আকাশে এই উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পেয়েছিলেন। তারা দেখে পন্ডিতেরা বুঝলেন পৃথিবীতে নতুন রাজা জন্মেছেন। তাঁকে দেখার জন্য তাঁরা রওনা দিলেন। তারাটিকে অনুসরণ করে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন দামি দামি উপহার।

অবশেষে তাঁরা বেথলেহেম নগরে এসে পৌঁছালেন। গোয়াল ঘরের উপরে এসে তারাটি থামল। পন্ডিতেরা গোয়াল ঘরের ভিতরে গিয়ে যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেলেন। উপহারগুলো দিয়ে তাঁরা যীশুকে প্রণাম জানালেন। আমরাও যীশুকে খুঁজে পেতে চাই। তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে চাই। যীশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে আমাদের করণীয় হলো:

১। যীশুর কথা মেনে চলা;
২। তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা;
৩। পবিত্র হওয়া;
৪। গরিব ও অভাবী ভাইবোনদের দান করা;
৫। অসহায় মানুষের যত্ন নেওয়া।

কী শিখলাম

ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতাকে পৃথিবীতে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিদাতা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসলেন। রাখালদের কাছে মুক্তিদাতার জন্মের সংবাদ শুনে রাখালেরা ও তিনজন পন্ডিত শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে এসেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর তা লেখ।
২। তোমাদের জানা যেকোন একটি বড়দিনের গান কর।
৩। একজন গরিব শিশুর জন্য কিছু দান কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মারীয়াকে যীশুর জন্মের সুসংবাদটি দিয়েছিলেন স্বর্গদূত .....।
খ। যীশুর জন্ম হয়েছিল ..... নগরে।
গ। যীশুর জন্মের পর তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন .....পন্ডিতেরা।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা হলো	ক। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন ঘটান।
খ। আমরা যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি	খ। তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন।
গ। মুক্তিদাতার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল	গ। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন।
	ঘ। পবিত্র হয়ে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কথা দিয়েছিলেন মানুষকে মুক্ত করতে তিনি পাঠাবেন একজন

(ক) প্রবক্তা (খ) মুক্তিদাতা (গ) স্বর্গদূত (ঘ) রাজা

৩.২ স্বর্গদূতের সংবাদে মারীয়া খুব

(ক) আনন্দিত হলেন (খ) ভয় পেলেন (গ) অস্থির হলেন (ঘ) রাগ করলেন

৩.৩ স্বর্গদূতেরা বেথলেহেমে যীশু জন্মাবার খবর প্রথম দিয়েছিলেন

(ক) রাজা হেরোদকে (খ) পণ্ডিতদের (গ) রাখালদের (ঘ) প্রবক্তাদের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার নাম কী?

খ। যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

গ। কোন রাজা লোক গণনার আদেশ জারি করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

খ। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর?

গ। মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনাটি লেখ।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার দান ও ফল

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যগণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করছিলেন, যীশুর মতো করে লোকেরা তাঁদেরও মেরে ফেলবে। তাই তাঁরা একটা বন্ধ ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন। এমন সময়ে প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পবিত্র আত্মা নেমে আসার ঘটনাটি এখন আমরা জানব।

পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনা

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এসে গেল। প্রেরিতশিষ্যগণ তখনও প্রার্থনায় রত ছিলেন। হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড একটি শব্দ শোনা গেল। খুব জোরে বাতাস বয়ে গেল। তারপর দেখা গেল শিষ্যদের মাথার উপর ছোট ছোট আগুনের শিখা। এই আগুনের শিখার আকারেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর নেমে আসলেন। তখন শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার শক্তি পেলেন। সেই শক্তিতে তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা জোরে জোরে ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তির কথা ঘোষণা করতে লাগলেন।

মারীয়া ও প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার আগমন

শব্দ শুনে নানা জাতি ও ভাষার মানুষেরা সেখানে এসে সমবেত হলেন। তারা সবাই নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথা বুঝতে পারছিলেন। এতে লোকেরা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কারণ শিষ্যগণ আগে যেসব ভাষা জানতেন না, তা তাঁরা হঠাৎ কীভাবে জানলেন?

শিষ্যদের মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে তা জানার জন্য লোকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছিল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলেন 'এই ব্যাপারটির মানে কী?' লোকেরা কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মনের সব ভয় দূর হয়ে গেল। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাঁরা নির্ভয়ে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। পবিত্র আত্মার আলোতে তারা সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন।

পবিত্র আত্মার দান

দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের উপরও পবিত্র আত্মা নেমে আসেন। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। শিষ্যদের তিনি বিভিন্ন গুণ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একইভাবে তিনি বিভিন্ন গুণ বা দান নিয়ে আমাদের উপরও নেমে আসেন। দানগুলো দিয়ে তিনি আমাদের শক্তিশালী করেন। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা পবিত্র আত্মার সাতটি দানের কথা জানি।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও অর্থ

১। প্রজ্ঞা: সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারা।
২। বুদ্ধি: কোন বিষয়ের গভীর অর্থ বুঝতে পারা।
৩। বিবেক: ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা।
৪। মনোবল: দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে খ্রিষ্টীয় জীবনের কষ্ট ও সমস্যা মোকাবেলা করা।
৫। জ্ঞান: নতুন ও অজানা বিষয়ে বেশি করে জানার গভীর ইচ্ছা।
৬। ধর্মানুরাগ: ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসা।
৭। ঈশ্বরভীতি: ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান

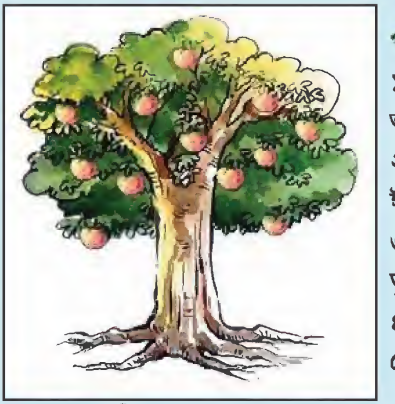

পবিত্র আত্মার দানের ফল

পবিত্র আত্মার দানের ফল ও তাদের অর্থ

১। ভালোবাসা: বিনিময়ে কোন কিছু না চেয়ে অন্যদের মঙ্গল করা।

২। আনন্দ: যা কিছু সত্য ও সুন্দর তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা।

৩। শান্তি : ভালো কাজ, কথা, চিন্তার কারণে তৃপ্তি, ভয়হীন ও নিরাপত্তা অনুভব করা।

৪। সহিষ্ণুতা: কষ্টকর বিষয়গুলোকেও সহজভাবে মেনে নেওয়া।

৫। সহৃদয়তা: ভালোবাসা সহকারে হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করা।

৬। মঙ্গলানুভবতা: সবকিছুতে ভালো শক্তির উপস্থিতি বোঝা।

৭। বিশ্বস্ততা: বিশ্বাস রক্ষা করা।

৮। কোমলতা: বিনয় ও নম্রতার সাথে আচরণ করা।

৯। আত্মসংযম: মন্দকে দমন করার শক্তি।

১০। ধৈর্য: কোন কিছুতেই নিরাশ না হওয়া।

১১। মৃদুতা: ধীরস্থির, নম্র ও ভদ্র আচরণ করা।

১২। বিশুদ্ধতা: কথা, কাজ ও আচরণের মিল থাকা। সবকিছুতে সৎ থাকা।

পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার উপায়

১। পবিত্র আত্মার কাছে সব সময় প্রার্থনা করা

২। পবিত্র আত্মার প্রেরণা বোঝা ও সেভাবে জীবন যাপন করা

৩। পবিত্র আত্মার পরিচালনা মেনে চলা

৪। মন খোলা রাখা

৫। বিশ্বাস রাখা

৬। সদ্‌গুণের অনুশীলন করা

গান: পবিত্র আত্মা হৃদয়ে এসো
তোমারি আলো হৃদয়ে ঢালো
মোচন কর হে অন্ধকার।

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও তার ব্যাখ্যা ভালোমতো বুঝেছি। পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলেরও অর্থ বুঝতে পেরেছি। পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভের উপায় শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। সাত পাপড়ির একটি ফুল আঁক। ফুলের মাঝখানে একটি ছোট হৃদয় আঁক। এবার সাতটি পাপড়ির মধ্যে সাতটি দান লেখ (ফুলটি হলে তুমি এবং হৃদয়টি হলো পবিত্র আত্মা)।
২। পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো মুখস্থ কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। বিবেক হলো.....বুঝার ক্ষমতা।
খ। বিশুদ্ধতা হলো কথা, কাজ ও .....মিল থাকা।
গ। পবিত্র আত্মার দান লাভের উপায় হলো সবসময় পবিত্র আত্মার কাছে .....করা।
ঘ। কোমলতা মানে হলো ..... ও নম্রতার সাথে আচরণ করা ।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন
(ক) পিতা (খ) পবিত্র আত্মা (গ) স্বর্গদূত (ঘ) পুত্র

২.২ পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যেরা খুব
(ক) আনন্দিত হলেন (খ) সাহসী হলেন (গ) সবল হলেন (ঘ) ভয় পেলেন

২.৩ আনন্দ অর্থ হলো সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে

(ক) ঈশ্বরের প্রশংসা করা (খ) সৎ হওয়া

(গ) খুব খুশি হওয়া (ঘ) ভয় না পাওয়া

২.৪ ঈশ্বর ভীতির অর্থ হলো

(ক) ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া (খ) ঈশ্বরকে ভালোবাসা

(গ) ঈশ্বরকে জানা (ঘ) ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও।

খ। কোন পর্বের সময় পবিত্র আত্মা প্রথম নেমে এসেছিলেন?

গ। পবিত্র আত্মার দান কয়টি?

ঘ। পবিত্র আত্মার দানের ফল কয়টি?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পবিত্র আত্মার সাতটি দানের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ। পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম লেখ।

গ। পবিত্র আত্মার দান লাভ করার পাঁচটি উপায় লেখ।

দশম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলী

সারা জগতের খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি খ্রিষ্টীয় সমাজ। এই সমাজের নাম হলো খ্রিষ্টমণ্ডলী। যীশু খ্রিষ্ট নিজে মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এটিকে তুলনা করা হয় মানব দেহ বা দ্রাক্ষালতার সঙ্গে। এটিকে আবার একটি পরিবারও বলা যায়। আমরা সকলে দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে এই মণ্ডলী বা পরিবারের সন্তান হয়েছি।

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি পরিবারের মতো

খ্রিষ্টীয় পরিবার

মা, বাবা ও সন্তান নিয়ে একটি পরিবার হয়। পরিবারে একজন কর্তাব্যক্তি থাকেন। তিনি পরিচালনা করেন। অন্য সকলের সাথে তাঁর একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের কারণে পরিবারের সকল সদস্য নিজ নিজ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে। এভাবে একটি সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টমণ্ডলীও একটি পরিবারের মতো। এই পরিবারের অদৃশ্য কর্তা হলেন পিতা ঈশ্বর। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সদস্য হয়েছি। যীশু আমাদেরকে পরিচালনা করে পিতার দিকে নিয়ে যান।

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি দেহের মতো, যীশু হলেন দেহের মাথা

আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা হলেও সব মিলে এক দেহ। খ্রিষ্টমণ্ডলীও তেমনি একটি মানব দেহের মতো। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা এই দেহের অঙ্গ হয়েছি। এখন আমরা সবাই এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমাদের দেহে চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিজ নিজ কাজ আছে। তারা নিজ নিজ কাজ ঠিকভাবে পালন করে বলে দেহ সুস্থ, সবল ও সচল থাকে।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

মস্তক হিসেবে খ্রিস্টের ভূমিকা

মানব দেহে মাথা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি খ্রীস্টমণ্ডলীর মস্তক যীশুও মণ্ডলীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

মানব দেহের মাথা	খ্রিস্টমণ্ডলীর মাথা
আমাদের দেহ চলে মাথার পরিচালনায়।	মণ্ডলী চলে যীশু খ্রিস্টের পরিচালনায়।
মাথা ছাড়া মানুষের দেহ বাঁচে না।	খ্রিস্ট ছাড়া মণ্ডলী বাঁচে না।
বিপদ দেখলে আমাদের মাথা সংকেত দেয়। এভাবে সব অঙ্গকে সে নিরাপদে রাখে।	খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীকে পালন ও রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন।
আমাদের মাথা সব অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে একতা বজায় রাখে।	খ্রিস্ট তাঁর সকল ভক্তের মধ্যে একতা আনেন।
আমাদের দেহের সব অঙ্গের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।	খ্রিস্টের কাছে সব ভক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।
আমরা নিজ নিজ দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পছন্দ করি।	খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র রাখতে চান।

মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। খ্রিস্টের সাথে এক থাকা
২। পবিত্র জীবন যাপন করা
৩। মঙ্গলবাণী প্রচার করা
৪। উপাসনা করা
৫। প্রতিবেশীদের সেবা ও দয়ার কাজ করা
৬। মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করা

একদিন একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের রঙধনু আঁকতে বললেন। শিক্ষার্থীরা রঙধনু আঁকলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র দুই রং দিয়ে রঙধনু বানালো। এতে তাদের রঙধনুগুলো ঠিকমত আঁকা হলো না এবং ততটা সুন্দরও দেখাল না। কিন্তু যারা সাত রং ব্যবহার করে রঙধনু বানালো তাদেরগুলো চমৎকার হলো। তাদের রঙধনুগুলো দেখে সবাই খুব আনন্দ পেল ও প্রশংসা করল। এতে আমরা বুঝতে পারি, সাত রং মিলেছে বলে রঙধনু বেশি সুন্দর হয়েছে। মণ্ডলীও ঠিক তেমনি সবার অংশগ্রহণে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

কী শিখলাম

যীশু খ্রিষ্ট হলেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ। তিনি মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা অবশ্যই দরকার। একেক জন একেক ভূমিকা পালন করলেও আমরা সবাই এক দেহ।

পরিকল্পিত কাজ

১। একটি রঙধনুর ছবি আঁক।

২। মণ্ডলীতে তুমি কী ভূমিকা পালন করতে পার তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত সমাজকে বলা হয় .....।

খ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হবার জন্য ..... গ্রহণ করতে হয়।

গ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন .....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা হলেও	ক। পালন ও রক্ষা করেন।
খ। খ্রিস্টভক্তগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে	খ। সব সময় পবিত্র রাখেন।
গ। খ্রিস্ট তাঁর দেহকে	গ। সব মিলে এক দেহ।
	ঘ। মণ্ডলী জীবন্ত থাকে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশ টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ মণ্ডলীর মস্তক হলেন

(ক) বিশপ (খ) পোপ (গ) যীশু খ্রিস্ট (ঘ) যাজক

৩.২ মণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা হলো

(ক) নিজের গুণ প্রকাশ করা (খ) সেবা করা

(গ) সবাইকে এক করা (ঘ) উপাসনা করা

৩.৩ নিচের কোনটি মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব

(ক) বাণী প্রচার করা (খ) ভক্তদের পবিত্র করা

(গ) মণ্ডলীকে পালন করা (ঘ) মণ্ডলীকে গতিশীল রাখা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিস্টমণ্ডলী বলতে কী বুঝ?

খ। কে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন?

গ। খ্রিস্টমণ্ডলীকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ঘ। খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচালক কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিস্টমণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা কী?

খ। খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

গ। মানবদেহের মাথা ও খ্রিস্ট মণ্ডলীর মাথার সাথে তুলনা কর।

একাদশ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত

সাক্রামেন্তকে অন্যকথায় বলা হয় সংস্কার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আগে আমরা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম জেনেছি। সেগুলোর নাম হলো: (১) বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান; (২) পাপস্বীকার; (৩) খ্রিষ্টপ্রসাদ (প্রভুর ভোজ); (৪) হস্তার্পণ; (৫) রোগীলেপন (রোগীদের জন্য প্রার্থনা); (৬) যাজকবরণ; ও (৭) বিবাহ। এখন আমরা জানব, সাক্রামেন্ত কী? এরপর বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব।

সাক্রামেন্ত কী ?

সাক্রামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন বা উপায়। এগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা ঢেলে দেন। কৃপাকে আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের জীবন। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে মাটিতে রস সৃষ্টি করে ও উর্বরতা বাড়ায়। ঈশ্বরের কৃপাও তেমনিভাবে আমাদের জীবনকে সিক্ত ও উর্বর করে।

ঈশ্বরকে আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। তাঁর কৃপাও আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখি না। কিন্তু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও তাঁর কৃপা দেখতে পাই। সাক্রামেন্তে ব্যবহৃত কিছু বাহ্যিক চিহ্নের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা দিয়ে থাকেন। এরূপ কয়েকটি চিহ্ন হলো: পবিত্র বাইবেল, মানুষের কথা, পবিত্র জল, পবিত্র তেল, মোমবাতি, আগুন, ক্রুশচিহ্ন, ক্রুশমূর্তি, রুটি, দ্রাক্ষারস, আর্ঘটি ইত্যাদি।

দীক্ষাস্নান ও এর প্রয়োজনীয়তা

দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম খ্রিষ্টমণ্ডলীর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্রামেন্ত । এটাকে মণ্ডলীতে প্রবেশের দরজা বলা হয়। কারণ অন্যসব সাক্রামেন্তের আগে এটি গ্রহণ করতে হয়। কাথলিক ও এ্যাংলিকান মণ্ডলীতে শিশু ও বয়স্ক উভয়কেই দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে শুধু

বয়স্কদেরকে এই সাক্রামেন্ত দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানকে সেখানে অবগাহনও বলা হয়। দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্মকে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে বলা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

যীশু খ্রিস্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দীক্ষাস্নান দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে সকল জাতির সকল মানুষের কাছে যেতে বলেছেন। তাদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে বলেছেন। যারা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করে তাদেরকে তিনি দীক্ষাস্নান দিতে বলেছেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন। তিনিই একটি নতুন সমাজ গঠন করেছেন। এটিকে আমরা বলি খ্রিস্টমণ্ডলী। এটি একটি বড় পরিবার। এই পরিবারের পিতা হলেন ঈশ্বর। যীশু খ্রিস্ট এই পরিবারের প্রথম সন্তান। তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করার পথ খুলে দিয়েছেন। দীক্ষাস্নানের পর আমরা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিস্টান তার আত্মায় পবিত্র আত্মার চিহ্ন গ্রহণ করে। কাগজে যেমন করে সীলমোহর দেওয়া হয় তেমনি করে আমাদের আত্মায় সীলমোহর দেওয়া হয়। এই সীল আর কোন দিন মুছে ফেলা যায় না। সে সারা জীবনের জন্য খ্রিস্টান হয়ে যায়।

যীশুর দীক্ষাস্নান

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

ক) কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

এই অনুষ্ঠানে মা–বাবা ও ধর্মপিতামাতা উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত শিশুর কপালে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করে দেন। তার বুকে পবিত্র তেল মেখে দেন। মা–বাবা ও ধর্মপিতামাতা শিশুর হয়ে শয়তানকে পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারা খ্রিস্টীয় বিশ্বাস স্বীকার করেন।

তারপর শিশুর মাথায় জল ঢেলে দিতে দিতে যাজক বলেন, "(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) . . . . . পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।" এরপর শিশুর কপালে পবিত্র তেল লেপন করে দেওয়া হয়। মা–বাবা ও ধর্মপিতামাতা হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নেন। তারা শিশুর অন্তরে বিশ্বাস জ্বলন্ত রাখবে বলে প্রতিজ্ঞা করেন। বড় হয়ে সে নিজেও শয়তান পরিত্যাগ করার ও বিশ্বাস জ্বলন্ত রাখার প্রতিজ্ঞা করে।

শিশুর দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

খ) প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয় না কিন্তু তাদেরকে গির্জায় এনে উৎসর্গ করা হয়। শিশুরা বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তখন তাদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। পিতামাতার সাথে ধর্মপিতামাতা উপস্থিত থাকেন। দীক্ষাস্নান যারা চায় তাদেরকে নদীতে বা পুকুরে অবগাহনের মাধ্যমে দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানের সময় পালক বলেন, "(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) . . . . . পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।" এরপর দীক্ষিত ব্যক্তি খ্রিষ্ট মণ্ডলীর সদস্য হয়।

কী শিখলাম

সাক্রামেন্ত কী, কয়টি ও কী কী? দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি। বিভিন্ন মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান রীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

সাক্রামেন্তে যে বাহ্যিক উপকরণগুলো ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। সাক্রামেন্তকে অন্যকথায় সংস্কার বা .....বলা হয়।

খ। সাক্রামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিক .....বা উপায় ।

গ। দীক্ষাস্নানকে অন্যকথায় মণ্ডলীতে প্রবেশের .....বলা হয়।

ঘ। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে আমরা দ্বিতীয় .....লাভ করি ।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বরের কৃপা হলো	ক। আমরা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি ।
খ। ঈশ্বরের কৃপার ফলে আমরা	খ। মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করি।
গ। দীক্ষাস্নানের পর যীশুর মধ্য দিয়ে	গ। ঈশ্বরের অলৌকিক দান ।
	ঘ। ভালো মানুষ হতে পারি ।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কৃপা আমরা কীভাবে দেখতে পারি?

খ। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান কার চিহ্ন গ্রহণ করে?

গ। ঈশ্বরের পরিবার বলতে কী বুঝায়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সাক্রামেন্ত কাকে বলে? সাক্রামেন্ত কয়টি ও কী কী?

খ। সাক্রামেন্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ। দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পন্ন হয় তা লেখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

নোয়া (নোহ)

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রায় এগার শত বছর পরের কথা। তখন পৃথিবীতে বাস করতেন ঈশ্বরভক্ত নোয়া। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে আমরা তাঁর পরিচয় পাই। তাঁর বাবার নাম ছিল লামেখ ও ঠাকুরদাদার নাম মেথুসেলাহ। সেই সময় পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ পথে চলছিল। কিন্তু নোয়া ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলছিলেন। নোয়া ঈশ্বরের চোখে ভালো মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

নোয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সব মানুষকে ভালো পথে ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা শুনলো না। নোয়া ঈশ্বরভক্ত ছিলেন বলে রক্ষা পেলেন। কিন্তু অন্যরা ধ্বংস হলো।

বিপথগামী মানুষ

নোয়ার সময়ে পৃথিবীটা পাপী মানুষে ভরে গিয়েছিল। লোকেরা একে অন্যকে ঠকাতো, ঘৃণা করত ও মারামারি করত। তারা ঈশ্বরের কথা শুনতো না। তাতে ঈশ্বর ভীষণ দুঃখ পেলেন। তিনি নোয়াকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পৃথিবীর সব মানুষ আমি ধ্বংস করে ফেলব। তাদের সাথে সব প্রাণীও ধ্বংস করে ফেলব।

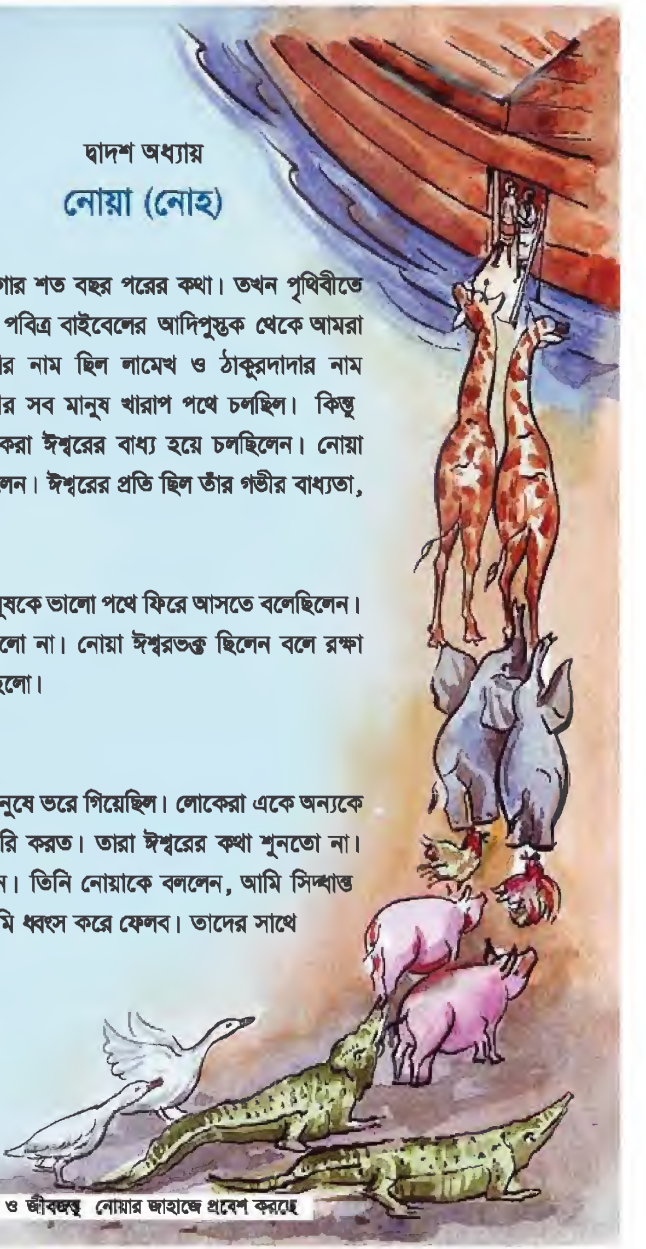

মানুষ ও জীবজন্তু নোয়ার জাহাজে প্রবেশ করছে

নোয়ার জাহাজ

ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তুমি বড় একটি জাহাজ তৈরি কর। তারপর তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন কর। ঈশ্বরের কথা অনুসারে নোয়া একটি বড় জাহাজ তৈরি করলেন। সেটি ছিল তিনশত হাত লম্বা পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। জাহাজটিতে ছিল তিনটি তলা ও একটি মাত্র দরজা।

ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি একটি জলপ্লাবন পাঠাবেন। এতে পৃথিবীর সকল জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে যাবে শুধু নোয়া ও তাঁর পরিবার। তাই ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি যেন পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করেন। সঙ্গে যেন নিয়ে যান সব জাতের এক জোড়া করে পাখি, পশু ও সরিসৃপ। ঈশ্বর নোয়াকে নিজের ও জীবজন্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে বললেন। নোয়া ঈশ্বরের কথা অনুসারে তাঁর পরিবার, জীবজন্তু ও পশুপাখিদের নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করলেন।

মহাপ্লাবন ও অবিশ্বস্তদের ধ্বংস

ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে নোয়া জাহাজে উঠলেন। এর সাত দিন পর শুরু হলো বৃষ্টি। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পানিতে বন্যা দেখা দিল। সব বাড়িঘর, জমিজমা ডুবে গেল। বন্যার পানিতে জাহাজটি ভাসতে লাগল। একশত পঞ্চাশ দিন ধরে চারিদিকে বন্যার পানি থাকল। জাহাজের ভিতরে থাকা নোয়া, তাঁর পরিবার ও প্রাণীরা বেঁচে গেল। কিন্তু বাইরের সব মানুষ ও জীবজন্তু ডুবে মরল। এরপর স্থলভূমি থেকে সব পানি নেমে যেতে শুরু করল। দশ মাস পর পর্বতের চূড়া দেখা গেল।এর চল্লিশ দিন পর নোয়া জাহাজের জানালা খুললেন। তিনি একটি দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন।

মহাপ্লাবন ও নোয়ার জাহাজ

কিন্তু সেটি কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে এলো। পরে তিনি একটি কবুতর ছেড়ে দিলেন। কোন শুকনা জমি না থাকায় সে কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে সেও ফিরে এলো। আরও সাত দিন পরে তিনি আবার সেই কবুতরটিকে ছেড়ে দিলেন। সন্ধ্যা বেলায় সেটি ফিরে এলো। কবুতরের ঠোঁটে দেখা গেল জলপাই গাছের একটা কচি পাতা। নোয়া বুঝতে পারলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। আরও সাত দিন পরে সেই কবুতরটিকে আবার ছেড়ে দিলেন। এবার সে আর ফিরে এলো না। এবার নোয়া বুঝলেন, বন্যা চলে গেছে।

মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

বন্যা শেষে জাহাজ থেকে নোয়া ও তাঁর পরিবারের সকলে নামলেন। ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করেছেন বলে তাঁরা একটা যজ্ঞবেদী তৈরি করলেন। যজ্ঞ নিবেদনের মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

মহাপ্লাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি কথা দিলেন, বড় প্লাবন দিয়ে তিনি আর কখনও সারা পৃথিবী ধ্বংস করবেন না। এর চিহ্ন হিসেবে তিনি আকাশে একটি রঙধনু স্থাপন করলেন। এটিই ছিল মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা। এই কারণে তিনি ঈশ্বরভক্ত হতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু অন্য সকল বিপথগামী মানুষেরা ধ্বংস হলো।

পরিকল্পিত কাজ: নোয়ার জাহাজ অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। নোয়া ঈশ্বরের চোখে ..... মানুষ ছিলেন।

খ। ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল গভীর ....., ভালোবাসা।

গ। জাহাজটি ছিল ..... তলা।

ঘ। মহাপ্লাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর ..... প্রকাশ করলেন।

ঙ। মানব জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন হলো ..... ।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল	ক। নোয়া জাহাজে উঠলেন।
খ। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে	খ। ধ্বংস হলো।
গ। কবুতরের ঠোঁটে দেখা গেল	গ। বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।
ঘ। সকল বিপথগামী মানুষেরা	ঘ। রঙধনু স্থাপন করলেন।
ঙ। তিনি আকাশে একটি	ঙ। জলপাইগাছের একটা কচি পাতা।
	চ। বন্যা দিলেন।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বর নোয়াকে কী তৈরি করতে বললেন?

খ। কতদিন যাবৎ বৃষ্টি হয়েছিল?

গ। বন্যার পর নোয়া জাহাজ থেকে কী ছেড়ে দিলেন?

ঘ। নোয়া কেন যজ্ঞ বেদী তৈরি করেছিলেন?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। নোয়া কেমন লোক ছিলেন? ঈশ্বর তাকে কী করতে বললেন?

খ। মহাপ্লাবনের বর্ণনা দাও।

গ। নোয়ার জাহাজের বর্ণনা দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা

যীশু খ্রিষ্ট এসেছেন সেবা করতে, সেবা পেতে নয়। শেষ ভোজের সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবার আদর্শ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের একটা নতুন আদেশ দিলাম। তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন দীন–দুঃখী, অভাবী ও অবহেলিত মানুষকে সেবা করি। তাদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সেবা করতে পারি। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। একারণে যুগে যুগে অনেক মানুষ দীন–দুঃখী ও অবহেলিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে থাকেন। এমনই একজন মহীয়সী নারী মাদার তেরেজা। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে উজ্জ্বল এক সেবার আদর্শ।

মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশব

মাদার তেরেজা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার (বর্তমান মেসিডোনিয়ার) স্কোপিয়ে নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিকোলা বয়াজিও এবং মায়ের নাম দ্রানাফিলে বয়াজিও। তাঁর বাবার আসল বাড়ি ছিল আলবেনিয়ায় এবং মায়ের বাড়ি ছিল কসোভো দেশে। নিকোলা ও দ্রানাফিলের ঘরে ছিল তিন সন্তান। মাদার তেরেজা ছিলেন তৃতীয় ও সবার ছোট। তেরেজার ছোটবেলার নাম ছিল আগ্নেস গন্‌জা বয়াজিও। তাঁর গায়ের রং ছিল গোলাপি। একারণে তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন গন্‌জা। গন্‌জা শব্দের অর্থ ফুলের কুঁড়ি।

শৈশবে আগ্নেস দয়ার কাজ সম্পর্কে বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হন। এরপর থেকে আগ্নেস মণ্ডলীর কাজে জড়িত হওয়ার প্রতি আগ্রহী হন। তিনি এ বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করতে থাকেন। প্রার্থনা ও ধর্মীয় গানে তিনি অধিক সময় ব্যয় করতে থাকেন।

ব্রতীয় জীবন

যুবতী থাকাকালেই আগ্নেসের মধ্যে গোটা জীবন ঈশ্বরের কাজে নিয়োজিত করার গভীর ইচ্ছা জেগে ওঠে। তিনি একজন পুরোহিতের কাছে গিয়ে মনের কথা বলেন। সেই পুরোহিত তাঁকে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন। এরপর ১৮ বছর বয়সে তিনি লরেটো সিস্টার–সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই নভিশিয়েট শেষে ব্রত গ্রহণ করে তিনি তেরেজা নাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মিশনারী হিসেবে ভারতে আসেন। সিস্টার তেরেজা কলকাতার সেন্ট মেরী'স স্কুলে শিক্ষকতা করার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ভূগোল ও খ্রিস্টধর্ম পড়াতেন। এখানে দরিদ্র ও দুঃখী মানুষ দেখে খুবই ব্যথিত হন। তাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের কথা ভাবতে থাকেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে তিনি চিরব্রত গ্রহণ করেন। একবার তিনি দার্জিলিং যাওয়ার পথে ঈশ্বরের একটি নতুন ডাক শুনতে পান। ঈশ্বর তাঁকে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে বলেন। পোপের অনুমতি পেয়ে তিনি লরেটো কনভেন্ট ত্যাগ করেন। এরপর কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা দরিদ্র লোকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকে তিনি ঐ শহরের অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের রক্ষীদূত নামে পরিচিত হন। তিনি নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরতে শুরু করেন।

মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংঘ

মাদার তেরেজা কলকাতা শহরের বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর দীনদুঃখীদের সেবাদানে নতুন সংঘ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তিনি প্রথমে পোপ মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পেয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মিশনারীজ অব চ্যারিটি' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি

সেবাকেন্দ্র খোলেন। আশ্রয়হীন ও মরণাপন্ন রোগীদের তিনি এখানে আশ্রয় দেন। নিজ হাতে তিনি তাদের যত্ন করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাঁর কাজের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নতুন নতুন সেবাকেন্দ্র খুলতে থাকেন। সংঘের সদস্য সংখ্যাও অনেক বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আশ্রমটি খোলেন। বর্তমানে এদেশে মোট ১১টি সেবাকেন্দ্র আছে। তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে অন্ধ, নুলা, বৃদ্ধ, কুষ্ঠরোগী ও মৃতপ্রায় মানুষের সেবা চলতে থাকে। প্রতি পদে তাঁর কাজে অনেক বাধা আসতে থাকে। কিন্তু কোন বাধাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে নি।

অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার হৃদয়টা ছিল বিশাল সমুদ্রের মতো। অবহেলিত, অসহায় ও গরিব মানুষদের জন্য মমতা ও ভালোবাসায় তিনি ছিলেন পূর্ণ। একদিন তিনি নোংরা এক ড্রেনের পাশ থেকে একটি মৃতপ্রায় লোককে তুলে আনলেন। তার সারা গায়ে ঘা এবং দুর্গন্ধে ভরা। মাদার তেরেজা তার গায়ের ঘা গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। নিজ হাতে তার সেবা যত্ন করলেন। তা দেখে লোকটি বলল, 'এই পর্যন্ত আমি বেঁচে ছিলাম রাস্তার কুকুরের মতো। আপনার ভালোবাসা ও সেবা পেয়ে এখন আমি দেবদূতের মতো মরতে যাচ্ছি'। মাদার তেরেজা যদি এমন কোন অসুস্থ লোকের কথা শুনতেন যার সেবা করার কেউ নেই, তিনি তখনই সেখানে ছুটে যেতেন। কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মারোগী, অনাথ শিশু, বোবা, বধির ও বিকলাঙ্গ শিশুদের তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন। তাদেরকে তিনি গভীর ভালোবাসায় বুকে টেনে নিতেন। অবহেলিত মানুষদের মাঝে তিনি প্রভু যীশুর মুখ দেখতে পেতেন।

দরিদ্রদের সেবায় মাদার তেরেজা

পুরস্কারে ভূষিত মাদার তেরেজা

তাঁর কাজে সব শ্রেণির মানুষ খুবই সন্তুষ্ট ছিল। নানাবিধ পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কারটি হলো নোবেল শান্তি পুরস্কার। তিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর। পুরস্কার থেকে তিনি যত অর্থসম্পদ পেয়েছেন সবই তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে দান করে দিয়েছেন।

মাদার তেরেজার মৃত্যু

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাদার তেরেজা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। কলকাতার শিশুভবনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এসময় পৃথিবীর বড় বড় নেতৃবর্গসহ হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সমাধিস্থানটি বর্তমানে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

ধন্য মাদার তেরেজা

তাঁর সংঘে বেশ কিছু পুরোহিত এবং ব্রাদার সদস্যও রয়েছেন। পৃথিবীর ১৩৭টি দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি সদস্য আছেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর মাদার তেরেজা ধন্যশ্রেণিভুক্ত হন। খুব শীঘ্রই তাঁকে মণ্ডলীর একজন সাধ্বী হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রেম, দয়া, ও সেবার জন্য তিনি চিরদিন সবার হৃদয়ে প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

কী শিখলাম

যীশুর ভালোবাসার কারণে মাদার তেরেজা সেবা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মানব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি 'মিশনারীজ অব চ্যারিটি' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ কী কী কাজ করেন দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। তুমি কীভাবে মানব সেবায় অংশগ্রহণ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মাদার তেরেজার বাবার নাম ..... ।

খ। মাদার তেরেজার ছোট বেলার নাম ছিল ..... ।

গ। যীশু খ্রিষ্ট এসেছেন ..... ।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ মাদার তেরেজা লরেটা সিস্টার সংঘে প্রবেশ করেন কত বছর বয়সে

ক) ১৬ বছর খ) ২২ বছর গ) ১৮ বছর ঘ) ২৫ বছর

২.২ মাদার তেরেজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন

ক) ইংল্যান্ড খ) যুগোস্লাভিয়া গ) কলকাতা ঘ) রুমানিয়া

২.৩ মাদার তেরেজার প্রাপ্ত সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার কোনটি?

ক) নোবেল খ) প্রেসিডেন্ট গ) ভারতরত্ন ঘ) স্বাধীনতা

২.৪ মাদার তেরেজা কাদের জন্য 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন

ক) কুষ্ঠরোগী খ) মৃত্যুপথ যাত্রী গ) অনাথ শিশু ঘ) বধির শিশু

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বর মাদার তেরেজাকে কী আদেশ দিলেন?

খ। অসুস্থ এবং মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের কাছে মাদার কী নামে পরিচিত হন?

গ। গন্‌জা শব্দের অর্থ কী?

ঘ। দীন দুঃখী মানুষের সেবাদানে কোন সংঘ খোলা হয়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ?

খ। কীভাবে মাদার তেরেজা সেবা কাজের আহ্বান পেলেন?

গ। মাদার তেরেজা কী কী সেবা কাজ করেছেন?

চতুর্দশ অধ্যায়

মৃত্যু ও পুনরুত্থান

আমরা এখনও ছোট শিশু। তবুও আমরা মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করব। কারণ জন্ম নিলে একদিন মরতে হবে। এটাই ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম। একদিন আমাদেরও ডাক আসবে। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জন্ম নেই না। কেউ নিজের ইচ্ছায় মারাও যাই না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুই শেষ নয়, এর পরে আছে পুনরুত্থান। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে যাওয়ার সুযোগ পাই। পিতার কাছে গেলেই আমরা চিরদিন সুখে থাকতে পারব।

জগতে মৃত্যু আসার কারণ

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন মৃত্যু ছিল না। আমাদের আদি পিতামাতা তখন স্বর্গেই বাস করতেন। কিন্তু তাঁরা পাপ করলেন বলে স্বর্গ থেকে তাঁদের এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। এখানে তাদের কঠিন পরিশ্রম করে চলতে হয়েছে। আমাদের আদি পিতামাতার পাপের কারণে জগতে মৃত্যু এসেছিল। তাই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দৈহিক মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়

দুইটি পথ

মানুষের সামনে থাকে দুইটি পথ। একটি স্বর্গের পথ ও অন্যটি নরকের পথ। আমাদের স্বাধীন চিন্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমরা কোন পথে চলব। যারা স্বর্গের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে তারা চিরদিন সুখে বাস করে। কিন্তু যারা নরকের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নরকে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা চিরদিন অতি কষ্টে দিন কাটায়।

মানুষের পুনরুত্থান

সুমন তার দাদুকে খুব ভালোবাসতো। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন আগে মারা গেলেন। দাদুকে হারিয়ে সুমনের অনেক দুঃখ। সে কিছুতেই তার দাদুকে ভুলতে পারে না। একদিন সে বাড়ির সকলের সাথে গির্জায় গেল। উপাসনার সময় সে পবিত্র বাইবেল থেকে ঈশ্বরের এই বাণী শুনতে পেলো: "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে–কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না।" এর পরে একটি গান হলো। গানের কথাগুলো হলো:

যে বিশ্বাস করিবে প্রভু যীশুর নামে জীবিত রবে সর্বদাই,
তিনিই পথ, তিনিই সত্য, তিনিই অনন্ত জীবন।

এরপর সে একদিন তার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে পুনরুত্থানের বিষয়ে আরও অনেক

বিষয় জানতে পারল। সে জানতে পারল যে, আমরা সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করব। তবে আবার সবাই পুনরুত্থানও করব। এরপর শেষ বিচার হবে। সেখানে ঠিক করা হবে কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে যাবে। তাই আমাদের সকলকে সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

সুন্দর জীবন গঠন

সুন্দর জীবন অর্থাৎ চরিত্র গঠনের উপর আমাদের অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ চরিত্রহীন মানুষের অনেক সুন্দর গুণ থাকলেও তা কাজে আসে না। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "মানুষের চরিত্র হলো গাছের মতো এবং সুনাম হলো গাছের ছায়ার মতো।" গাছ না থাকলে যেমন ছায়া হয় না, চরিত্র না থাকলে তেমনি সুনাম হয় না। কাজেই সুন্দর চরিত্র গঠন করা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার জন্যও আমাদের সুন্দর জীবন অবশ্যই গঠন করতে হবে। সুন্দর জীবন গঠনের উপায়গুলো হলো:

১। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা
২। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে চলা
৩। প্রতিদিন প্রার্থনা করা
৪। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ঠিকমত পালন করা
৫। ক্ষমা করা ও নেওয়া
৬। আত্মা বিশুদ্ধ রাখা
৭। অভাবী ও গরিব–দুঃখীদের সেবা করা

কী শিখলাম

একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে। তবে আমরা সকলেই পুনরুত্থান করব। এ পৃথিবীতে আমাদের সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে সুন্দর জীবন যাপন করা যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মৃত্যুর পরে আছে ..... ।

খ। আমিই ..... ও জীবন ।

গ। মানুষ দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ..... কাছে যায়।

ঘ। আমাদের সকলকে ..... জীবন যাপন করতে হবে।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এলে	ক। স্বর্গ ও নরক।
খ। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে	খ। জন্ম নেই না ।
গ। মানুষের সামনে থাকে দুইটি পথ	গ। একদিন মরতে হবেই।
ঘ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখলে	ঘ। সুন্দর জীবন গড়তে পারব ।
	ঙ। আত্মা বিশুদ্ধ রাখা ।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পিতা ঈশ্বরের কাছে গেলে আমরা কেমন থাকব?

খ। আদি পিতামাতাকে কেন স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হলো?

গ। মানুষের সামনে কয়টি পথ আছে?

ঘ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কার কাছে ফিরে যাব?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সুন্দর জীবন যাপন করার উপায়গুলো লেখ?

খ। পৃথিবীতে মৃত্যু কীভাবে আসলো?

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বাসমন্ত্র

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমরা যা বিশ্বাস করি তা মেনে চলার চেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে জানি। এখানে আমরা বিশ্বাসমন্ত্রের অর্থ এবং কীভাবে বিশ্বাসের পথে চলা যায় সেই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করব।

বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র

বিশ্বাস হলো কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া। 'মন্ত্র' অর্থ রহস্য। আর বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ বিশ্বাসের রহস্য। আমরা আগে জেনেছি যে, রহস্য এমন একটা বিষয় যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না বা বাদ দিয়েও চলতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস করি। যেমন, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে তিনি করেছেন তা আমরা বুঝি না। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের পালন ও রক্ষা করেন। তাই আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি। বিশ্বাসকে অন্য কথায় শ্রদ্ধাও বলা হয়। তাই কখনও কখনও আমরা বিশ্বাসমন্ত্র না বলে শ্রদ্ধামন্ত্র বলে থাকি। যীশুর প্রেরিতশিষ্যগণ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একত্রে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র বলা হয়।

বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো

১। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু তাঁরই অধীনে।

২। আমি যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ।

৩। যীশু আমাদের জন্য যাতনাভোগ করেন ও ক্রুশবিদ্ধ হন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও পাপ থেকে মুক্ত করতে চান। যীশু আমাদের জন্য সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করেন।

৪। যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। পোন্তিয় পিলাত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বিনা দোষে যীশু আমাদের জন্য ক্রুশের উপর মরেছেন।

৫। যীশু আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা। যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে যারা মারা গেছে তিনি তাদের জন্যও মরেছেন।

৬। যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন। এভাবে মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছেন। পিতা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলেছেন।

৭। যীশু পুনরুত্থান করে আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন দয়ালু মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদের পাশে থেকে আমাদের রক্ষা ও পালন করেন।

৮। যীশু স্বর্গারোহণ করেছেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমরাও পুনরুত্থান করে তাঁর কাছে যাব। তিনি আমাদেরকে স্বর্গে স্থান দিবেন।

বিশ্বাস স্বীকার ও পাপ পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নবায়ন

৯। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। আমরা মন্দ আত্মার দ্বারা চলি না। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলে আমরা মন্দ শক্তিকে জয় করতে পারি।

১০। আমি মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি। মণ্ডলী একটি দেহের মতো। এর মস্তক যীশু খ্রিস্ট। তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পরিচালনা করছেন।

বিশ্বাসের পথে চলা

ক) আমরা জগতের আলো হব। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি আমরাও মানুষের অবিশ্বাস দূর করব।

খ) আমি সকলের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে চলব। যীশুর আত্মা একতা আনার জন্য আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। দলাদলি দূর করে আমরা সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টি করব।

কী শিখলাম

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। খ্রিস্টধর্মের মূল বিষয় হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ : বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ বলবে।

আমরা জগতের আলো হবো

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি ..... করি।

খ। যীশু সকল মানুষের ..... ।

গ। যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ..... ।

ঘ। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা ..... জয় করতে পারি।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ	ক। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন
খ। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই	খ। ক্রুশের উপরে মরেছেন
গ। যীশু আমাদের জন্য	গ। যীশু খ্রিস্ট
ঘ মণ্ডলীর মস্তক	ঘ। ঈশ্বরকে পাওয়া যায়
	ঙ। বিশ্বাসের রহস্য

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। কে যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন?

খ। বিশ্বাসকে অন্যকথায় কী বলা হয়?

গ। বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একসঙ্গে কী বলা হয়?

ঘ। মন্ত্র অর্থ কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ৫টি মূল বিষয় নিজের ভাষায় লেখ।

খ। বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ লেখ।

গ। বিশ্বাসের পথে কীভাবে চলবে?

ষোড়শ অধ্যায়

ভূমিকম্প

প্রকৃতির মধ্যে কখনও কখনও কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। যেমন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হারিকেন, বন্যা, খরা, সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এগুলো ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি। এসব দুর্ঘটনা মানুষ, পশুপাখি, ফসল, ধনসম্পদ ইত্যাদির প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এগুলোর কারণে অনেক সময় অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এগুলো পরিবেশকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব কারণে দেশের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা ভূমিকম্পের ক্ষতিকর দিকসমূহ ও ভূমিকম্পের পর আমাদের করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করব।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

ঘরে থাকলে মজবুত টেবিল, খাট বা সোফার নিচে বসে বা শুয়ে পড়তে হবে। যতক্ষণ ভূমিকম্প না থামে ততক্ষণ সেখানেই থাকতে হবে। গ্লাসের দরজা–জানালা, আয়নার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। লিফ্‌ট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ভগ্নস্তূপের নিচে আটকা পড়ে গেলে সঙ্গে বাঁশি থাকলে তা বাজাতে হবে। নতুবা পানির পাইপ বা দেয়ালে জোরে জোরে আঘাত করতেই থাকবে। এগুলো সম্ভব না হলে চিৎকার করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরে করণীয়

ভূমিকম্প থেমে গেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে হবে বের হওয়া নিরাপদ কি না। নিরাপদ হলে ঘর থেকে বের হতে হবে। ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করতে হবে। আহত বা আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারে সহায়তা করতে হবে। বিশেষত শিশু ও বয়স্কদেরকে আগে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। বেশি আহতদেরকে একা নাড়াচাড়া না করে এক জায়গায় রেখে দিতে হবে। সাহায্যকারী ব্যক্তিদের ডাকতে হবে। কোথাও নিভিয়ে ফেলার মতো ছোটখাট আগুন থাকলে তা নিভিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ভূমিকম্পের পরে অনেক সময় আগুন লেগে যায়। ব্যাটারী–চালিত রেডিও থাকলে তা চালাতে

হবে। উদ্ধার সম্পর্কে জরুরি খবর শুনতে হবে। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে থাকলে সুনামি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। গ্যাসের গন্ধ পেলে সাবধানে গিয়ে গ্যাসের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর সেখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কারণ আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে। কোন বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে বিদ্যুতের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে।

উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা

প্রায়ই ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। তখন সবচেয়ে বেশি দরকার হলো:

১। আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করা
২। আহতদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া
৩। ডাক্তার ও নার্স ঔষধ নিয়ে আসা। আহতদের সেবা করা
৪। খাবার, পানীয় ও কাপড়চোপড় বিতরণ করা
৫। ভীত মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া

আহতদের চিকিৎসা ও সেবাদান

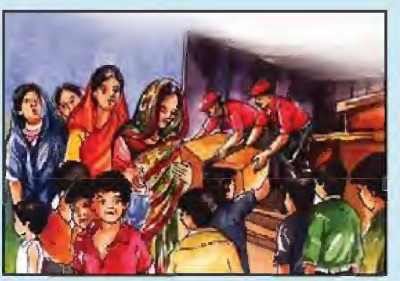

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

কী শিখলাম

ভূমিকম্প হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। সেখানে মানুষের কোন হাত নেই। ভূমিকম্পের সময় আমাদের করণীয়গুলো মনে রাখতে হবে। ভূমিকম্পের পর সেবাকাজে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কী কী ভাবে সাহায্য করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এগুলোকে প্রাকৃতিক .....বলা হয়।

খ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশকে নানাভাবে ..... করে।

গ। ভূমিকম্পের পর আহত মানুষদের .....স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মানুষ, পশুপাখি, ফসল, ধনসম্পদ ইত্যাদির

(ক) নিরোধ করে (খ) অপচয় করে (গ) ক্ষয় করে (ঘ) ক্ষতি সাধন করে

২.২ সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে থাকলে সচেতন থাকতে হবে

(ক) বন্যা সম্পর্কে (খ) ভূমিকম্প সম্পর্কে

(গ) সুনামি সম্পর্কে (ঘ) ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে

২.৩ ভূমিকম্পের পর ভীত মানুষকে দিতে হবে

(ক) অভয় (খ) সান্ত্বনা (গ) আশা (ঘ) ভালোবাসা

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাঁচটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদহারণ দাও।

খ। ভূমিকম্পের পর কাদের আগে সাহায্য করতে হবে?

গ। ভূমিকম্পের পর কী কী জিনিসপত্র বিতরণ করা দরকার ?

ঘ। সেবা বিষয়ে যীশু কী বলেছেন।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ভূমিকম্পের সময় কী করণীয় তা লেখ ।

খ। ভূমিকম্পের পরে কী করণীয় তা বর্ণনা কর।

গ। তুমি কীভাবে উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা করতে পার তা লেখ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ

আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে ভালোবাসি। আমাদের মাতৃভূমিকেও আমরা স্বাধীন রাখতে চাই। কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে এই মাতৃভূমিটি দিয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, তা আমরা নিজের চোখে দেখি নি। বড়দের কাছ থেকে, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ বা বই থেকে আমরা জেনেছি। আমরা জানি, আমাদের দেশের অনেক মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে খ্রিষ্টান শহিদও রয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা দরকার। এ জন্য তাঁদের সম্পর্কে আমাদের আরও ভালো করে জানা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধ কী ?

পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা আমরা শোষিত হচ্ছিলাম। আমরা ছিলাম পরাধীন। এই শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের দেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ঐ বছরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের দেশে গণহত্যা শুরু করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারা অনেক মানুষ হত্যা করেছিল। বহু বাড়িঘর তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়েছিল। তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমাদের দেশের মানুষ যুদ্ধে নেমেছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। এই যুদ্ধকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাদের আমরা বলি মুক্তিযোদ্ধা। যাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা বলি শহিদ।

খ্রিষ্টান শহিদ

ফাদার ইভান্স সি এস সি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষ যোগ দিয়েছিল। সবাই তখন দেশকে মুক্ত করার চিন্তা করেছে। কে কোন ধর্মের, তা কেউ চিন্তা করেনি। চিন্তা করেছে শুধু কীভাবে পাকিস্তানিদের পরাজিত করা যাবে। কীভাবে আমাদের প্রিয় দেশটাকে মুক্ত করা যাবে। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান প্রচুর।

অন্যদের মতো খ্রিষ্টানরা দুইভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, আবার কেউ কেউ আড়ালে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্তত ২৪ জন খ্রিষ্টান এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন পুরোহিত রয়েছেন। পুরোহিতদের নাম হলো: ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী এবং ফাদার মারিও ভেরোনেসি, এসএক্স। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক ধর্মপল্লীতে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা দিয়েছেন। টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করেছেন। যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছিল তাদেরকে তাঁরা ধর্মপল্লীতে বা স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না করে দিতেন বা খাবার পৌঁছে দিতেন।

ফাদার লুকাস মারান্ডী

ফাদার মারিও ভেরোনেসি

সকলের লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

আমাদের লোকেরা প্রাণ দিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এরপরের কাজ হলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও সকলে গণতন্ত্রকেই পছন্দ করি। কারণ গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা। অধ্যাপক সিলী বলেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণ থাকে। শাসনব্যবস্থায় সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে থাকে? দুইভাবে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। যেমন, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। তাঁরা দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। সকল মানুষের নিরাপত্তা দান করেন। দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। এসব কাজ তাঁরা আদেশ দিয়ে পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষভাবে সকলেই দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যেমন, ভোট দিয়ে শাসনকর্তা নির্বাচন করার মাধ্যমে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি।

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে এবং প্রার্থনার মাধ্যমেও আমরা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারি।

গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা

১। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারে

২। জনগণের ইচ্ছা অনুসারে সরকার পরিচালিত হয়

৩। সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন

৪। এখানে আইনের চোখে সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমান

৫। সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক সুন্দর থাকে

৬। ছোট ছোট দল ভয়ে ভয়ে থাকে না

৭। নিজ নিজ গুণ বিকাশের বেশি সুযোগ পাওয়া যায়

৮। দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ বেশি থাকে ।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। সকল মানুষ প্রকৃত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করুক। দেশের উন্নতি হতে থাকুক। আমরা যেন সকলে ভালো মানুষ হতে পারি। দেশকে যেন আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি।

কী শিখলাম

দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। অনেক খ্রিস্টান মানুষও শহিদ হয়েছেন। আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্র সবচেয়ে সুন্দর শাসনব্যবস্থা।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন এমন পাঁচজনের নাম লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। আমরা ..... হাতে বন্দী ছিলাম।

খ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু .....ডাক দিয়েছিলেন।

গ। গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো .....।

ঘ। ২৬ শে মার্চ আমাদের .....।

ঙ। আমাদের বিজয় দিবস .....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ দিয়েছেন	ক। মতামত প্রকাশ করতে পারে।
খ। দেশের শাসনব্যবস্থায় সকলে	খ। অধিকার আদায় করতে পারে।
গ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ	গ। তাঁদের আমরা বলি শহিদ।
	ঘ। দুইভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল:

(ক) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে

৩.২ ফাদার উইলিয়াম ইতাল, সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী এবং ফাদার মারিও ভেরোনেসি, এসএক্স এই তিনজন ফাদার হলেন:

(ক) বিদেশি বণিক (খ) শহিদ (গ) মুক্তিযোদ্ধা (ঘ) সাধু

৩.৩ অধ্যাপক সিলী বলেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সবার

(ক) চাকরি আছে (খ) বক্তব্য আছে (গ) ভূমিকা আছে (ঘ) অংশগ্রহণ আছে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধ কী?

খ। কাকে শহিদ বলা হয়?

গ। কত মাস যুদ্ধ করার পর দেশ বিজয় অর্জন করেছে ?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান লেখ ।

খ। গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা কারণগুলো লেখ।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩-খ্রি

সুন্দর আচরণই পুণ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত— বিক্রয়ের জন্য নয়।